

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহা সফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোনিয়া আক্তার

রোলঃ 23090121503

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মহা সফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সোনিয়া আক্তার

রোলঃ 23090121503

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ মহা সফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সোনিয়া আক্তার, আইডিঃ 23090121503 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ মহা সফলতা ও চূড়ান্ত ব্যর্থতা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সোনিয়া আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

সোনিয়া আক্তার

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

আইডিঃ 23090121503

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

সফলতা ও ব্যর্থতার পরিচয়	5
সূরা আশ্-শামস থেকে সফলতা ও ব্যর্থতার পরিচয়	8
ঈমান.....	12
তাকওয়া	29
নেক আমল.....	53
তাওবা ও আত্মশুদ্ধি.....	72
সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা	89
আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া.....	100
কুফর ও শিরক	106
অন্যায়, জুলুম ও অহংকার.....	116
হালাল ও হারামের প্রতি উদাসীনতা.....	124
আখিরাতকে ভুলে যাওয়া চূড়ান্ত ব্যর্থতার ফলাফল.....	130

সফলতা ও ব্যর্থতার পরিচয়

মানুষের জীবনের মূল লক্ষ্য কি? ধন - সম্পদ, খ্যাতি, ক্ষমতা — এসব কি আসল সফলতা? নাকি এর বাহিরেও কোনো চূড়ান্ত বাস্তবতা আছে? ইসলাম এ প্রশ্নের গভীরে গিয়েই সফলতা ও ব্যর্থতার মৌলিক সংজ্ঞা দিয়েছে।

মহা সফলতা বলতে সাধারণত এমন চূড়ান্ত সাফল্য বুঝায়, যা কেবল দুনিয়ায় নয়, পরকালেও কল্যাণ বয়ে আনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে লাভ হয়। অন্যদিকে চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলতে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে বুঝায়। দুনিয়ার জীবনে ভাল কাজ করা ও আল্লাহর নির্দেশিত পথে চলাই মহা সফলতার পথ, আর এর বিপরীত কাজ করা ব্যর্থতার নামান্তর। পার্থিব দৃষ্টিকোন থেকে সফলতা বলতে আমরা যা বুঝি-

উচ্চশিক্ষা লাভ, অর্থ - সম্পদ অর্জন, সামাজিক মর্যাদা লাভ, সুখি জীবন

কিন্তু ইসলাম বলে, এসব শুধুমাত্র বাহ্যিক বা সাময়িক সফলতা। আসল বা মহা সফলতা (العظيم الفوز) হলো:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ .

"প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেওয়া হবে। অতঃপর, যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই সফলকাম। আর পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ভোগ ছাড়া আর কিছুই নয়" (সূরা আলে ইমরান : ১৮৫)

ইসলামিক মতে মহা সফলতা

ইসলামিক মতে মহা সফলতা বলতে বোঝানো হয় সেই চূড়ান্ত অর্জন, যা দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় জীবনেই কল্যাণ বয়ে আনে। মানুষ সাধারণত সফলতা বলতে দুনিয়ার সম্পদ, খ্যাতি, পদমর্যাদা বা ভোগবিলাসকে বুঝে নেয়। কিন্তু ইসলাম শেখায়, দুনিয়ার এই অর্জনগুলো সাময়িক, এগুলোর স্থায়িত্ব নেই। প্রকৃত সফলতা হলো সেই অবস্থান, যেখানে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাতের অধিকারী হয়। একজন মুমিনের জীবনের লক্ষ্য শুধু দুনিয়ার উন্নতি নয়, বরং আখিরাতে মুক্তি ও পরম প্রশান্তি অর্জন। তাই ইসলামিক দৃষ্টিতে সফলতার মূল চাবিকাঠি হলো ঈমান, আমল ও তাকওয়া।

একজন ঈমানদার ব্যক্তি জানে, দুনিয়ার জীবন একটি পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় যারা আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, তাঁর নির্দেশ মেনে চলে, হারাম ও অন্যায থেকে বিরত থাকে, তারা আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে ওঠে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে সৃষ্টি করেছেন যেন তারা সঠিক পথ অনুসরণ করে, অন্যায থেকে দূরে থেকে সৎ জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি এই জীবনব্যবস্থায় আল্লাহর আদেশ মেনে চলে এবং রাসূল (স.) এর দেখানো পথ অনুসরণ করে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফল। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি দুনিয়ার সাময়িক সুখে মগ্ন থেকে আল্লাহকে ভুলে যায়, তার সফলতা কেবল বাহ্যিক ও অস্থায়ী। ইসলাম বলে, এই ধরনের সফলতা প্রকৃত নয়, বরং বিভ্রান্তি।

মহা সফলতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো আত্মার শান্তি। দুনিয়ার সম্পদ ও ভোগবিলাস কখনও অন্তরের প্রশান্তি এনে দিতে পারে না। বরং আল্লাহভীতি, ইবাদত ও সৎকর্মই মানুষের মনে স্থায়ী তৃপ্তি আনে। যে ব্যক্তি নামাজ, রোজা, জাকাত, সৎ আচরণ ও আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করে, সে দুনিয়ায়ও শান্তি পায় এবং আখিরাতে জান্নাতের পুরস্কার লাভ করে। ইসলাম শেখায়, এই পৃথিবী আসলে চিরস্থায়ী আবাস নয়— এটি পরকালের প্রস্তুতির স্থান। তাই বুদ্ধিমান ও সফল মানুষ সে-ই, যে দুনিয়ার সামান্য লাভের পরিবর্তে আখিরাতে অসীম সুখের জন্য পরিশ্রম করে।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামিক মতে মহা সফলতা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভ করা। এটি সেই সফলতা যা কখনও শেষ হবে না, যা দুঃখ ও কষ্টমুক্ত, এবং যা আল্লাহপ্রদত্ত চিরন্তন সুখের প্রতীক। দুনিয়ার জীবনের সামান্য কষ্ট বা ত্যাগ এই সফলতার তুলনায় তুচ্ছ। তাই একজন মুসলমানের কর্তব্য হলো জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করা, তাঁর বিধান অনুসরণ করা এবং অন্যায থেকে বিরত থাকা। এইভাবে জীবন পরিচালনা করতে পারলেই মানুষ লাভ করবে সেই “মহা সফলতা”, যা ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বোচ্চ সম্মান ও চূড়ান্ত পুরস্কার।

ইসলামিক মতে চূড়ান্ত ব্যর্থতা

ইসলামের দৃষ্টিতে চূড়ান্ত ব্যর্থতা হলো সেই অবস্থা, যখন মানুষ দুনিয়ার সাময়িক সুখ-সমৃদ্ধিকে আসল সফলতা মনে করে আখিরাতে ভুলে যায়। ইসলাম শেখায় যে, মানুষের জীবন শুধু দুনিয়ার কয়েকটি বছরের জন্য নয়, বরং চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ অমান্য করে, পাপ ও অন্যাযের পথে চলে, নিজের নফস ও শয়তানের অনুসরণ করে, সে শেষ পরিণামে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দুনিয়ার সাফল্য যেমন সম্পদ, পদমর্যাদা বা খ্যাতি— এসব কিছুই মৃত্যুর পর আর কোনো উপকারে আসে না। চূড়ান্ত

ব্যর্থতা তখনই ঘটে, যখন মানুষ আখিরাতে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে চিরস্থায়ী শাস্তির মুখোমুখি হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি এমন এক ক্ষতি, যার কোনো প্রতিকার নেই। একজন মুমিনের জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও জান্নাত লাভ করা। কেননা, যে এই উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলে, সে যত বড় দুনিয়াবি অর্জনই করুক না কেন, ইসলামের দৃষ্টিতে সে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ।

কোরআনের ভাষা:

قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

“ বলুন, কেয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও পরিবারবর্গের তরফ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখ, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি”। (সূরা যুমার: ১৫)

আল্লাহর অবাধ্যতা করা। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা, হাদিসে পরিপন্থি কাজ করা এবং ভুল পথে চলা চূড়ান্ত ব্যর্থতার কারন

দুনিয়ার সাফল্যের মোহে পড়ে পরকালের ব্যর্থতায় পতিত হওয়া। সব পার্থিব সফলতা চূড়ান্ত সফলতা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে পার্থিব সফলতার পেছনে ব্যর্থতার ও পরাজয় লুকিয়ে থাকা। আখিরাতে ক্ষতি। পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করাই চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলা হয়

ঈমানহীন মৃত্যুবরণ করা

জাহান্নামে প্রবেশ হওয়া

সফলতা ও ব্যর্থতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বিষয়	সফলতা	ব্যর্থতার
বিশ্বাস	ঈমান ও তাওহীদ	শিরক ও কুফর
আমল	সৎ ও নিয়তের সাথে	গুনাহ, বেনিয়ত
জীবনদর্শন	আখিরাতমুখী	দুনিয়ামুখী
পরিনতি	জান্নাত	জাহান্নাম
আল্লাহর অবস্থান	সন্তুষ্টি	অসন্তুষ্টি

এই তুলনা আমাদের স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয়, চূড়ান্ত পরিনতি নির্ভর করে কিভাবে আমরা জীবন কাটাই তার উপর।

সূরা আশ্-শামস থেকে সফলতা ও ব্যর্থতার পরিচয়

কোরআনুল কারিমের ৯১ তম সূরা ‘আশ্ শামস’ একটি সংক্ষিপ্ত অথচ গভীর অর্থবহ সূরা। এটি সফলতা ও ব্যর্থতা, পাপ ও পূন্য, আত্মার পরিশুদ্ধি ও আত্মার ধ্বংসের এক গুঢ় ব্যাখ্যা প্রধান করে। সূরাটিতে আল্লাহ তায়ালা ১৪টি সপথ করেছেন। যা কোরআনের অন্যান্য সূরার তুলনায় সর্বাধিক সপথের একটি। এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয় মানুষের আত্মা ও তার সফলতা বা ব্যর্থতার মূল ভিত্তি।

সূরা আশ্-শামস আরবি ও অনুবাদ :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝^১
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝^২
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝^৩
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝^৪
وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝^৫
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝^৬
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۝^৭
فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝^৮
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا ۝^৯
وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝^{১০}
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۝^{১১}
إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ۝^{১২}
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۝^{১৩}
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۝^{১৪}
فَدَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بَذْنِهِمْ فَمَسُوهُنَّ ۝^{১৫}

বাংলা অনুবাদ (সারাংশ) :

১-৭: আল্লাহ বিভিন্ন সৃষ্টিজগতের উপাদান-সূর্য, চন্দ্র, দিন, রাত, আকাশ, পৃথিবী ও মানুষের আত্মার সপথ করেন।

৮: তারপর বলেন, তিনিই মানুষের আত্মাকে সজ্জিত করেছেন এবং তাকে ভালো ও মন্দ উভয়ের জ্ঞান দিয়েছেন।

৯: যে ব্যক্তি তার আত্মাকে দূষিত করেছে, সে ব্যর্থ হয়েছে।

১১-১৫: আল্লাহ ‘সামুদ’ জাতির একটি উদাহরণ দেন, যারা নবীর সতর্কতা উপেক্ষা করে পাপ করেছিল এবং ধ্বংস হয়েছিল।

সফলতার সংজ্ঞা সূরা শামসের আলোকে

সূরা শামসে সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে আত্মার পরিশুদ্ধি (تزكية النفس) ‘তাজকিয়াতুন নাফস’ কে উল্লেখ করা হয়েছে।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“সফল হয়েছে সে,যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে”।(আয়াত -৯)

এখানে “আফলাহা” শব্দটি এসেছে ‘ফালাহ’ (ح) শব্দ থেকে,যার অর্থ কেবল সফল নয় –
--বরং চূড়ান্ত মুক্তি, চিরস্থায়ী কল্যাণ ও দুনিয়া-আখিরাতে শান্তি।

সফল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য:

- ১.আত্মাকে পাপ থেকে দূরে রাখা
- ২.তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা
- ৩.নিজেকে শুদ্ধ করতে চেষ্টা
- ৪.আল্লাহর দেয়া ভালো-মন্দের জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা

ব্যর্থতার সংজ্ঞা সূরা শামসের আলোকে

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“নিশ্চয় ব্যর্থ হয়েছে সে,যে আত্মাকে কলুষিত করেছে”।(আয়াত-১০)

দাস্সাহা শব্দের অর্থ হচ্ছে চাপা দেওয়া,ঢেকে ফেলা,গোপন করা বা দূষিত করা।

ব্যর্থ ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য:

১. আত্মাকে গুনাহের মাঝে লিপ্ত রাখা
- ২.পাপকে গোপন রেখে চালিয়ে যাওয়া
৩. নিজেকে সংশোধন না করা
৪. আল্লাহর নসীহত অস্বীকার করা

আত্মার পরিশুদ্ধি ও কলুষতা

ইসলাম মানুষের আত্মাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়, কারণ আত্মাই মানুষকে সত্যিকার অর্থে মানুষ করে তোলে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বলেন, মানুষকে সৃষ্টি করার পর তিনি তার মধ্যে নিজের আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে আত্মা মানব জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু। আত্মার পরিশুদ্ধি (তাজকিয়া) মানে হলো অন্তরের অপবিত্রতা, অহংকার, হিংসা, লোভ, রাগ, কপটতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে নিজেকে গড়ে তোলা। একজন মুমিনের জীবনে আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন করা একটি বড় লক্ষ্য, কারণ এর মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত সুখ, শান্তি ও সফলতা লাভ করে। আত্মার পরিশুদ্ধি ছাড়া কোনো বাহ্যিক ইবাদতও পূর্ণতা পায় না।

আত্মার পরিশুদ্ধির পথ হলো তওবা, নামাজ, আল্লাহর স্মরণ, সংকাজ এবং নৈতিক চরিত্র গঠন। যখন মানুষ নিজের ভেতরের খারাপ চিন্তা ও প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে, তখন তার অন্তরে আল্লাহভীতি (তাকওয়া) জন্ম নেয়। এই তাকওয়াই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে এবং মানুষকে আল্লাহর নিকট প্রিয় করে তোলে। পরিশুদ্ধ আত্মা শান্ত, ধৈর্যশীল, দয়ালু ও ন্যায্যের পক্ষে অবস্থান নেয়। এমন ব্যক্তি কখনও অন্যায়, জুলুম বা প্রতারণার পথে পা বাড়ায় না। আত্মার পরিশুদ্ধি আসলে এক দীর্ঘ সাধনা, যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মূল উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে, আত্মার কুলষতা (অপবিত্রতা) হলো মানুষের অন্তরে জন্মে থাকা পাপ, ঈর্ষা, হিংসা, অহংকার, স্বার্থপরতা ও কামপ্রবৃত্তির আধিক্য। যখন কেউ নিজের মনকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তখন তার আত্মা ধীরে ধীরে কালিমায় ঢেকে যায়। এই কুলষতা মানুষকে অন্যায়ের পথে চালিত করে এবং তার বিবেককে অন্ধ করে দেয়। কুলষ আত্মা শান্তি হারায়, দুশ্চিন্তা ও অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হয়। এমন মানুষ ধন, মর্যাদা বা ক্ষমতার পিছনে ছুটে বেড়ায়, কিন্তু কখনও সত্যিকারের তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। আত্মার কুলষতা মানুষকে দুনিয়াতেও অস্থির করে তোলে এবং পরকালেও ক্ষতির মুখে ঠেলে দেয়।

ইসলাম আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য মানুষকে আল্লাহভীতি ও আত্মসমালোচনার শিক্ষা দিয়েছে। যেমন নিয়মিত সালাত আদায়, কুরআন তেলাওয়াত, রোজা রাখা, দান-সদকা করা এবং অন্যের প্রতি সদাচরণ করা—এসব কাজ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আবার মিথ্যা, অন্যায়, গীবত, লোভ ও অবাধ কামনা থেকে বিরত থাকা আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখে। একজন মুমিন যখন নিজের ভেতরের জগৎকে পরিশুদ্ধ রাখে, তখন তার জীবন হয়ে ওঠে প্রশান্ত ও আলোকিত। আল্লাহ তায়ালার দয়া ও রহমত তখন তার ওপর বর্ষিত হয়।

সুতরাং আত্মার পরিশুদ্ধি হলো মানব জীবনের প্রকৃত উন্নয়ন, আর কুলষতা হলো তার পতন। যারা নিজেদের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, তারা আল্লাহর নিকট মর্যাদাপূর্ণ ও সফল। আর যারা আত্মাকে কলুষিত করে রাখে, তারা নিজেদেরই ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তাই প্রত্যেক মানুষের দায়িত্ব হলো নিজেকে আত্মিকভাবে শুদ্ধ করা, যাতে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পরিপূর্ণ শান্তি লাভ করা যায়।

সামূদ জাতির ব্যর্থতার উদাহরণ

আয়াত ১১-১৫ -তে “সামূদ” জাতির কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। তারা ছিল নবী সালিহ (আ:) -এর জাতি। আল্লাহ তাদের একটি নির্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়েছিলেন--উটনী রক্ষা করার আদেশ। কিন্তু তারা অবাধ্য হয়ে উটনীকে হত্যা করে। এর ফলে আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেন।

শিক্ষা:

১. দুনিয়ার শক্তি ও সম্পদ দিয়ে সফলতা আসে না

২.আল্লাহর রাসূলদের অমান্য করলেই ধ্বংস অবধারিত

৩. পাপ করার পর গাফেল থাকাই সর্বোচ্চ ব্যর্থতা

আজকের মানুষের জন্য শিক্ষা:

সফলতা কি নয়: কেবল চাকরি,ডিগ্রি,অর্থবিত্ত,বাহ্যিক জৌলুস ও খ্যাতি, অহংকারী আচরন

সফলতা কী : অন্তরের পবিত্রতা,আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন,দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি

সফলতা পাওয়ার পথ: আত্মসমালোচনা করা,পাপ থেকে তওবা করা,নেক আমলে অভ্যস্ত

হওয়া,প্রতিদিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা, নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণে রাখা

ব্যর্থতা থেকে বাচার উপায়: অহংকার বর্জন করা,সৎ ও নেক সঙ্গ গ্রহন,সময়ের সঠিক ব্যবহার, খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করা,নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করা

সূরা আশ্-শামস আমাদের শিক্ষায় যে,প্রকৃত সফলতা কেবল বাহ্যিক অর্জনে নয়,বরং আত্মারশুদ্ধতায় নিহিত।আল্লাহ আমাদের আত্মাকে ভালো ও মন্দ চিনার শক্তি দিয়েছেন।এখন দায়িত্ব আমাদের, কোন পথ আমরা বেছে নেব।যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে সে সফল হবে।আর যে নিজের আত্মাকে গুনাহে নিমজ্জিত রাখবে সে ব্যর্থ হবে।

আসুন,সূরা আশ্- শামসের আলোকে নিজের আত্মার দিকে ফিরে তাকাই এবং সফলতার পথে যাত্রা করি।

ঈমান

ঈমান (إِيمَان) একটি আরবি শব্দ যার অর্থ বিশ্বাস, আস্থা, বা দৃঢ় প্রত্যয়। ইসলামী পরিভাষায় ঈমান বলতে আল্লাহ তায়ালায় পক্ষ থেকে মহানবী(সা.) যত বিধান -আহকাম হাসিল করেছেন এবং অকাট্য দলীল দ্বারা তা প্রমানিত হয়েছে তার কোনো একটি বাদ না দিয়ে সবগুলোকে মনে-প্রাণে বদ্ধমূলভাবে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তায়ালায় আদেশ -নিষেধ সঠিকভাবে এবং পূর্ণভাবে আমল করার মাধ্যমে এ ঈমান কামেল বা শক্তিশালী হয়।

আর আল্লাহর আদেশ - নিষেধ পালনে ত্রুটি করলে ঈমান নাকেস বা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঈমানের নূর নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় দীর্ঘদিন চলতে থাকলে এবং তাওবা না করলে আল্লাহ না করুক ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

কোরআন ও হাদিসে ঈমানের গুরুত্ব

কোরআনে-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝

"অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে"। (সূরা আল মুমিনুন : ২৩)

হাদিসে-

নবী মুহাম্মাদ (স.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি হৃদয় দিয়ে ঈমান আনে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

ঈমান ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। জান্নাতে প্রবেশের প্রথম শর্ত ঈমান। এটি মানুষকে সঠিক পথে পপরিচালিত করে। ঈমান মানুষের চরিত্রকে পরিশুদ্ধ করে

ঈমানের ৭ টি মূলস্তম্ভ রয়েছে ,

«أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ» ۝

আমি ঈমান আনলাম বা অন্তরের -অন্তঃস্থল থেকে বিশ্বাস করলাম -১. আল্লাহ তায়ালাকে ২. তার ফেরেস্টাগনকে ৩. তার প্রেরিত সকল আসমানি কিতাবকে ৪. তার প্রেরিত সকল নবী -রাসূলকে ৫. কিয়ামত দিবসকে ৬. তাকদির কে বিশ্বাস ৭. মৃত্যুর পর পুনর্বীর জীবিত হওয়া। উল্লেখিত ৭টি বিষয়ের মধ্যে ৭ং বিষয় ৫ং বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রশাখা। তবে তার বিশেষ গুরুত্বের কারনে তাকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো ঈমানের আরকান বা মূলভিত্তি। ঈমানের এ বিষয়গুলো ব্যাখ্যাসহকারে মনে -প্রাণে বিশ্বাস করা জরুরি। ঈমানের এ সকল বুনিয়াদি বিষয়গুলো সামনে ব্যাখ্যা করা হলো:

আল্লাহ তায়ালায় প্রতি ঈমান

আল্লাহ তায়ালায় উপর ঈমান আনার অর্থ এ কথা বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ এক, অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। যার কোনো প্রকার অংশ বা অংশীদার বা শরীক নেই, তার কোনো কিছুর অভাব নেই। তিনিই সকলের সব অভাব পূরণকারী। তিনি কারো পিতা নন, পুত্রও নন, তার সমতুল্য কেউ নেই। একমাত্র তিনিই সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা। কোন জ্ঞান বা চক্ষু আল্লাহ তায়ালাকে আয়ত্ত্ব করতে পারে না। তিনি চিরকাল আছেন এবং থাকবেন। তিনি অনাদি ও অনন্ত। তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য।

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সমস্ত কিছুর ধারক ও সংরক্ষণকারী।

তাকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।

আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে, সবই তাঁর।

কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে?

তিনি জানেন তাদের সামনে ও পেছনের সব কিছু।

তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন ততটুকু ছাড়া।

তাঁর কুরসী আসমান ও জমিনকে পরিব্যাপ্ত করে আছে।

এবং সেগুলোর সংরক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না।

তিনি মহান, অতিশয় উচ্চ। (সূরা বাকারা ০-২৫৫)

আল্লাহ তায়ালায় পরিচয় : তার অনেকগুলো অনাদি-অনন্ত সিফাত বা গুণ আছে, সেগুলো একমাত্র তার জন্যেই নির্ধারিত। সেসব গুণের মধ্যে অন্য কেউ শরীক নেই। যেমন “আর-রহমান” (অত্যন্ত দয়ালু), “আল -আলিম” (সর্বজ্ঞ), “আল-খালিক” (সৃষ্টিকর্তা) ইত্যাদি।

তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি আগুনকে পানি এবং পানিকে আগুন করতে পারেন। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি বিদ্যমান, তিনি হুকুম করলে মুহূর্তের মধ্যে এসব নিস্তনাবুদ হয়ে যাবে। তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি না জানেন -এমন কিছুই নেই। মনের মধ্যে যে ভাবনা বা কল্পনা উদয় হয়, তাও তিনি জানেন। তিনি সবকিছুই দেখছেন। তিনি সবকিছুই শুনছেন। মৃদু আওয়াজ এমনকি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ আওয়াজও তিনি শুনেন।

গায়েবের বিষয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তিনি ছাড়া আর কেউ গায়েব জানেন না। এমনকি নবী -রাসূল, অলীগনও জানেন না। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র হাজির-নাজির। তিনি ছাড়া আর কেই হাজির নাজির নন।

তিনি সব দোষ -ত্রুটি হতে পবিত্র। তিনিই বিপদ -আপদ দেন এবং তিনিই উদ্ধার করেন। প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদা তারই।

তিনি বড়ই দাতা। সমস্ত জীবের ও যাবতীয় চেতনা -অচেতন পদার্থের আহার তিনি দান করেন। তিনিই রুজির মালিক। রুজি কমানো বাড়ানো তারই হাতে। তিনি যার রুজি কমাতে চান, তাকে কম করে দেন। যার রুজি বাড়াতে চান তাকে বাড়িয়ে দেন।

তিনি ন্যায় পরায়ন, তার কোন কাজেই অন্যায় বা অত্যাচারের লেশমাএ নেই। তিনি জীবন দান করেছেন। ধন -রত্ন দান করেছেন, বিদ্যা-বুদ্ধি দান করেছেন। অধিকন্তু আখিরাতেও অসংখ্য ও অগণিত সাওয়াব ও নেয়ামত দান করবেন। কিন্তু তার ভান্ডার বিন্দু মাএ কমবে না।

আল্লাহ তায়ালা ওপর ঈমান আনার অর্থ শুধু আল্লাহ তায়ালা অস্তিত্ব স্বীকার করা নয় বরং অস্তিত্ব স্বীকার করার সাথে সাথে তার উপরুক্ত গুনবাচক কথাগুলো স্বীকার করাও জরুরি। নতুবা আল্লাহ পাকের ওপর সসম্পূর্ণভাবে ঈমান আনা হবে না এবং সে ঈমান গ্রহণযোগ্যও হবে না।

আল্লাহ তায়ালা প্রতি ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি :

ইসলামের মূল পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে প্রথমটি হলো:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল।"

এখানে প্রথম অংশটি সরাসরি আল্লাহর প্রতি ঈমানের ঘোষণা। যার অন্তরে আল্লাহ তায়ালা প্রতি ঈমান নেই, সে কখনোই প্রকৃত মুসলিম হতে পারে না। ঈমান ছাড়া আমল গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং ঈমান হলো ইসলামের মূল ভিত্তি।

আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য:

একজন প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে কিছু বিশেষ গুণাবলি থাকে যেমন:

১. তাকওয়া (আল্লাহভীতি)-সে গুনাহ থেকে বেঁচে চলে
২. সবার ও শোকর-বিপদে ধৈর্যধারণ করে ও সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে
৩. তাওয়াক্কুল-সে সব কাজে আল্লাহ ওপর ভরসা করে
৪. আমল -সে আল্লাহ আদেশ মান্য করে এবং নাফরমানি থেকে দূরে থাকে।
৫. আখিরাতে জীবন-সে দুনিয়া থেকে পরকালের জীবনকে গুরুত্ব দেয়

আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখার উপকারিতা: আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখা একজন মুসলিমকে বিভিন্নভাবে উপকার করে যেমন:

আন্তরিক প্রশান্তি-আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে জীবন-যাপন করলে মন শান্ত থাকে। ভয় ও হতাশা থেকে মুক্তি-ঈমানদার ব্যক্তি জানে, সবকিছু আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অধিন। সুন্দর চরিত্র গঠন-ঈমানদার ব্যক্তি সততা, দয়া, সহানুভূতি বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত থাকে। আখিরাতে মুক্তির নিশ্চয়তা-ঈমান ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ সম্ভব নয়।

আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাসের পরিণাম: যে ব্যক্তি আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, কিংবা তার সাথে শরীক করে তার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। কোরআনে বলা হয়েছে,

حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

"আল্লাহর দিকে একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে শরীক না করে; এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে যেন আকাশ থেকে ছিটকে পড়ল, অতঃপর মৃতভোজী পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করল" (সূরা

হজ্জ:৩১)

আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস মানুষকে বিপথগামী করে তুলে। সে দুনিয়াতে শান্তি পায় না এবং আখিরাতেও চিরশাস্তির শিকার হয়। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান একজন মুসলমানের জীবনের মূলভিত্তি ও চালিকাশক্তি। এই ঈমানই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে। ন্যায়নীতি শিক্ষায় এবং জান্নাতে এগিয়ে দেয়। আমাদের প্রত্যেকের উচিত, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমানের পরিচয় দেওয়া, তার আদেশ পালনে সচেষ্ট হওয়া এবং গুনাহ থেকে বেচে চলা। আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ঈমানই হতে পারে আমাদের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির চাবিকাঠি।

ফেরেশ্তাগণের প্রতি ঈমান

‘ঈমান বিল মালায়িকা’ অর্থ হলো ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। ‘মালায়িকা’ বা ‘ফেরেশতা’ শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ "মালাক" থেকে, যার অর্থ হলো বার্তাবাহক বা দূত। ফেরেশতারা হলেন আল্লাহর তৈরি একটি বিশেষ সৃষ্টিজাত গোষ্ঠী, যাঁরা আল্লাহর আদেশ পালনে সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। ফেরেশ্তাগণের ওপর ঈমান আনার অর্থ হলো এ কথা বিশ্বাস করা যে, মহান আল্লাহ এক ধরনের মাখলুককে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন। তাদেরকে ফেরেশ্তা বলে। তাঁরা পুরুষ বা মহিলা নন। বরং তাঁরা ভিন্ন ধরনের মাখলুক। অনেক ধরনের কাজ আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর সোপর্দ করে রেখেছেন। যেমন নবীগণের (আ.) নিকট অহী আনয়ন করা, মেঘ পরিচালনা করা, রুহ কবয করা, নেক-বদী লিখে রাখা ইত্যাদি। তাঁরা আল্লাহর প্রিয় ও ফরমাবরদার বান্দা।

ঈমানের স্তম্ভ: ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি মূল স্তম্ভের একটি। কেউ যদি ফেরেশতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলামের দৃষ্টিতে মু'মিন বা মুসলমান নয়। ফেরেশতাদের সৃষ্টির উৎস ও বৈশিষ্ট্য: ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর বা আলো থেকে। নবী করিম ﷺ বলেন:

"ফেরেশতাগণ সৃষ্টি হয়েছেন নূর থেকে" (সহিহ মুসলিম: ২৯৯৬)

বৈশিষ্ট্য:

১. ফেরেশতারা নর বা নারী নন।
২. তাঁদের শরীর নেই, তবে আল্লাহ যেভাবে চান তেমন রূপে প্রেরণ করেন।
৩. তারা কোন পাপ করে না।
- ৪.. তারা খায় না, পান করে না, বিশ্রাম নেয় না।
৫. তারা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কিছু করে না।
৬. তাদের ডানা থাকে। কেউ কারো চেয়ে বড় বা দায়িত্বে ভিন্ন।

কুরআনে ফেরেশতাদের উল্লেখ:

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান কোরআনের বহু স্থানে বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

أَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ غُفْرَانُكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ
 “রাসূল (সা.) বিশ্বাস স্থাপন করেছেন সেই বিষয়ে যা তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং মুমিনগণও। তারা প্রত্যেকে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলদের প্রতি। (তারা বলে) আমরা তাঁর কোন রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করি না। তারা বলেছে, ‘আমরা শুনেছি এবং মান্য করেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন।” (সূরা

বাকার: ২৮৫)

এছাড়াও বিভিন্ন সূরায় ফেরেশতাদের কাজ, দায়িত্ব, নাম এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ ফেরেশতারা ও তাঁদের দায়িত্ব:

জিবরাইল (আ.) ওহি বা আল্লাহর বাণী নবীদের নিকট পৌঁছানো
 মিকা'ইল (আঃ) রিজিক, বৃষ্টি, মেঘ, প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা
 ইসরা'ফিল (আঃ)কিয়ামতের দিনে শিংগা ফুঁকবেন
 আজরাইল (আঃ)মৃত্যু গ্রহণের দায়িত্ব (মালাকুল মাওত)
 রকীব ও আতীদ আমল লিপিবদ্ধ করেন (ডান ও বাম পাশে)
 মুনকার ও নাকির কবরের প্রশ্ন করেন
 হাফাযা ফেরেশতা রক্ষা ও পাহারার দায়িত্ব পালন করেন

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনার গুরুত্ব: এটি ঈমানের একটি স্তম্ভ। ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস না করলে কেউ মুসলিম হতে পারে না। এটি আল্লাহর প্রতি ঈমানের একটি অংশ। ফেরেশতাদের ওপর বিশ্বাস মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে, কারণ তারা জানে ফেরেশতা সব সময় তার কাজ রেকর্ড করছে।

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাসের প্রভাব: কেউ জানে ফেরেশতা তার আমল লিখছে, তাই সে খারাপ কাজ করতে ভয় পায়। আল্লাহভীতি বৃদ্ধি ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ পালন করে, এটা মানুষকে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য করতে উদ্বুদ্ধ করে। ধৈর্য ও আত্মতুষ্টি: ফেরেশতারা বিপদের সময় সাহায্য করে, এটা জানলে মানুষ ধৈর্যশীল হয়। দায়িত্ববোধ: প্রতিটি কাজ রেকর্ড হচ্ছে – এই বিশ্বাসে মানুষ সৎ হয়।

ফেরেশতারা কিভাবে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে: জান্নাতে যাওয়ার দোয়া করে: যারা আল্লাহর পথে চলে, তাদের জন্য ফেরেশতারা জান্নাতের দোয়া করে।

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ
“ যারা ‘আরশ’ বহন করে এবং যারা তার চার পাশে রয়েছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে, এবং তারা তার প্রতি ঈমান আনে এবং মুমিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা বলে: ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি দয়া ও জ্ঞানে সর্ববিষয়ে পরিব্যাপ্ত। অতএব, যেসব লোক তাওবা করে এবং তোমার পথে চলে, তাদের তুমি ক্ষমা করো এবং তাদের জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করো। (সূরা গাফির :আয়াত-৭)

আল্লাহর জিকিরকারীদের মাঝে থাকে শিক্ষা ও কোরআন পাঠের আসরে ফেরেশতারা হাজির হয়। তাদের ডান ও বাম পাশে বসে আমল লিপিবদ্ধ করে।

ফেরেশতাদের অস্বীকারের পরিণতি: ঈমানহারা বলে বিবেচিত হবে। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ভেঙে যাবে। কুরআন ও হাদিসকে অস্বীকার করার শামিল। পরকালে শাস্তি পেতে হবে। ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা একজন মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য অংশ। তারা আল্লাহর আনুগত্যশীল সৃষ্টিজীব, যারা তাঁর হুকুম পালন করে। আমাদের উচিত ফেরেশতাদের প্রতি সঠিক বিশ্বাস স্থাপন করা, তাদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা এবং বিশ্বাস করা যে তারা আমাদের প্রতিটি কাজ রেকর্ড করছে।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে ঈমান রাখার তাওফিক দিন। আমীন

আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ঈমান

আসমানি কিতাব হলো আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সেই গ্রন্থসমূহ, যা মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য প্রেরিত হয়েছে। ইসলাম ধর্মে আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ঈমান রাখা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঈমানের ছয়টি মূল বিষয়ের মধ্যে এটি একটি। একজন

মুসলমানের জন্য অপরিহার্য যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত সকল কিতাবের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন এবং তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবেন।

আসমানি কিতাব কী?

"আসমানি কিতাব" বলতে এসব গ্রন্থকে বোঝায়, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা ওহির মাধ্যমে বিভিন্ন নবী ও রাসুলের ওপর নাজিল করেছেন। এই কিতাবসমূহ আল্লাহর বিধান, নির্দেশনা ও হেদায়েত নিয়ে এসেছে। এর উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা।

আসমানি কিতাবসমূহের সংখ্যা ও নাম:চারটি প্রধান আসমানি কিতাবের কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ আছে:

১. তাওরাত (Torah) – নবী মূসা (আঃ)-এর ওপর নাজিল হয়েছিল।
২. জবুর (Psalms) – নবী দাউদ (আঃ)-এর ওপর নাজিল হয়েছিল।
৩. ইনজিল (Gospel) – নবী ঈসা (আঃ)-এর ওপর নাজিল হয়েছিল।
৪. আল-কোরআন – নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর নাজিল হয়েছে।

এছাড়াও আরও বহু সহীফা বা ছোট ছোট কিতাব বিভিন্ন নবীর ওপর নাজিল হয়েছিল, যেমনঃ হজরত ইব্রাহিম (আঃ)-এর ওপর সহীফা

হজরত শীশ (আঃ), ইদরিস (আঃ)-এর ওপরও কিতাব নাজিল হয় বলে বর্ণনা পাওয়া যায় কিতাবসমূহের বৈশিষ্ট্য:

১. আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত: প্রতিটি কিতাবই আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত এবং তা সত্য।
২. মানবজাতির হিদায়েতের জন্য: এই কিতাবসমূহে জীবন চলার পথনির্দেশনা, হালাল-হারামের বিধান এবং নৈতিক শিক্ষা রয়েছে।
৩. ভাষা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী: প্রত্যেক কিতাব সেই সময়ের জাতির ভাষায় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী নাজিল হয়েছে।
৪. চূড়ান্ত ও পূর্ণাঙ্গ কিতাব কোরআন: পূর্ববর্তী সব কিতাব আংশিক বা সময়সীমার জন্য ছিল, কিন্তু কোরআন শরীফ চিরন্তন, সর্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ।

আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ঈমান আনার মানে হলো:বিশ্বাস করা যে, এই কিতাবসমূহ আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য।তারা যেসব আদেশ-নিষেধ এবং হিদায়েত দিয়েছে, তা সঠিক ও হক ছিল।কোরআন শরীফ পূর্ববর্তী সব কিতাবকে নিশ্চিতকারী ও সংরক্ষিত গ্রন্থ।

পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের পরিবর্তন ও বিকৃতি:ইসলামের দৃষ্টিতে আজকের তাওরাত, ইনজিল ইত্যাদি আসমানি কিতাবের মূলরূপে আর নেই। সেগুলোর মধ্যে মানুষের তৈরি সংযোজন ও বিকৃতি ঘটেছে। যেমন:অনেক আয়াত বা অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে,মানুষের ভাষায়,পুনঃলিখিত

হয়েছে, কিছু ভুল বিশ্বাস ও কুসংস্কার ঢুকানো হয়েছে। তাই মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন যে, বর্তমান তাওরাত বা বাইবেল ইত্যাদি মূলরূপে অবশিষ্ট নেই।

কোরআন: সর্বশেষ ও সংরক্ষিত কিতাব:আল-কুরআন হলো সর্বশেষ আসমানি কিতাব, যা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ২৩ বছরে নাজিল হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
"নিশ্চয়ই আমি 'যিকর' (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমিই এর সংরক্ষণকারী।"

(সূরা আল-হিজর, আয়াত ৯)

সর্বজনীন: কোরআন কেবল কোনো নির্দিষ্ট জাতির জন্য নয়, বরং সমস্ত মানবজাতির জন্য।
চিরন্তন: কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের হেদায়েত কার্যকর থাকবে।

ব্যবহারিক জীবনবিধান: ইবাদত, সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, বিচারিক—সব দিকেই দিকনির্দেশনা রয়েছে।

কোরআনের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য:এটি হেদায়াতের কিতাব।এতে পূর্ববর্তী কিতাবের সত্য অংশগুলো আছে।

এটি মুজিয়া (আলৌকিক কিতাব), যার চ্যালেঞ্জ কেউ নিতে পারেনি।

মুসলমানদের জীবনে এটি পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে।

কিতাবসমূহের প্রতি ঈমানের উপকারিতা:আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, সঠিক পথের অনুসরণ নিশ্চিত হয়, মানবতার কল্যাণ সাধিত হয়, আখেরাতে মুক্তির মাধ্যম, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্ট হয়। আসমানি কিতাবসমূহের ওপর ঈমান রাখা একজন মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ। যদিও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ বিকৃত হয়েছে, তবুও আমরা বিশ্বাস করি সেগুলোর মূলরূপ ছিল সত্য ও আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিলকৃত। কোরআন শরীফ হচ্ছে সেই চূড়ান্ত কিতাব যা সকল কিতাবকে সমর্থন করে এবং যা চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাই মুসলমান হিসেবে আমাদের কর্তব্য হলো কুরআনকে জীবন চলার একমাত্র দিকনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করা এবং তার আলোকে জীবন গঠন করি।

নবী ও রাসূল (আ.) এর ওপর ঈমান

ইসলামের অন্যতম মূল বিশ্বাস হলো নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখা। ঈমানের ছয়টি মৌলিক ভিত্তির একটি হলো:

“وَرُسُلِهِ” অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত রাসূলগণের প্রতি ঈমান।

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান করেছেন এবং অন্যায়, কুসংস্কার ও শিরক থেকে ফিরিয়েছেন।

নবী ও রাসূল কারা?

নবী (নবি) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী লাভ করেন, কিন্তু তিনি নতুন শরীআত নিয়ে আসেন না। রাসূল হচ্ছেন সেই নবী যিনি নতুন শরীআত ও বিধান নিয়ে আসেন এবং মানুষকে তা অনুসরণ করার আদেশ দেন। সকল রাসূল নবী হন, কিন্তু সকল নবী রাসূল নন।

নবী ও রাসূলগণের সংখ্যা: হাদীসে এসেছে যে, নবী ও রাসূলদের সংখ্যা অনেক। একটি সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে:

নবী ছিলেন প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার জন, এবং

রাসূল ছিলেন ৩১৩ জন। (আহমদ, বাইহাকী, তাবারানী)

তবে কোরআনে যেসব নবী-রাসূলদের নাম উল্লেখ আছে, তারা ২৫ জন। এদের মধ্যে কিছু প্রখ্যাত নবী ও রাসূল হচ্ছেন:

হযরত আদম (আ.)

হযরত নূহ (আ.)

হযরত ইব্রাহিম (আ.)

হযরত মূসা (আ.)

হযরত ঈসা (আ.)

এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

নবী ও রাসূলগণের দায়িত্ব: নবী ও রাসূলগণ ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দিকনির্দেশনা ও আদর্শের বাহক। তাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল:

১. আল্লাহর তাওহীদ প্রচার করা।

২. শিরক ও কুসংস্কার থেকে মানুষকে বিরত রাখা।

৩. আল্লাহর বিধান অনুযায়ী মানুষকে জীবন পরিচালনায় উৎসাহিত করা।

৪. উত্তম চরিত্র ও নৈতিকতার শিক্ষা দেওয়া।

রাসূল (সা.) এর সর্বশেষতা: হযরত মুহাম্মদ (সা.) হচ্ছেন শেষ নবী ও রাসূল। কোরআনে বলা হয়েছে:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং নবীদের শেষনবী। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৪০)

তার পর আর কোনো নবী আসবেন না। ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তার মাধ্যমে।

নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য: নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখা মানে শুধু তাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাই নয়, বরং তাদের শিক্ষাকে মানা, তাদের আদর্শ অনুসরণ করা এবং তাদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা রাখা।

ঈমানের দাবী পূরণে করণীয়: কোরআনে বর্ণিত সকল নবী-রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস রাখা। নবী মুহাম্মদ (সা.) এর সুন্নাহ অনুসরণ করা। রাসূলদের প্রতি অশ্রদ্ধা বা সন্দেহ না রাখা। তাদের বার্তার প্রতি অনুগত থাকা।

নবী ও রাসূলদের মর্যাদা: আল্লাহ তাআলা নবী-রাসূলদেরকে সাধারণ মানুষদের চেয়ে উত্তম ও মর্যাদাবান করে সৃষ্টি করেছেন। তারা গুনাহ থেকে মুক্ত, সর্বোচ্চ চরিত্রবান এবং বিশ্বস্ত। রাসূল (সা.) এর প্রতি ভালোবাসা: নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের একটি অংশ। হাদীসে এসেছে:

“তোমাদের মধ্যে কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় না হই।” (সহীহ বুখারী)

নবী ও রাসূলদের প্রতি ঈমান রাখা একজন মুসলমানের ঈমানের অপরিহার্য অংশ। তাদের প্রতি ভালোবাসা, সম্মান, ও অনুগত্যের মাধ্যমে একজন মুসলমান পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারে। ইসলাম যেমন একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, তেমনি এই জীবনবিধানকে পোঁছে দেওয়ার জন্য আল্লাহ প্রেরণ করেছেন নবী ও রাসূলদের। তাদের প্রতি ঈমানই মুসলিম জীবনের ভিত্তি।

এই বিষয়টি কেবল বিশ্বাস নয়, বরং তা বাস্তব জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে হয়। রাসূল (সা.) এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করাই হলো প্রকৃত ঈমানের প্রমাণ।

কেয়ামত দিবসের ওপর ঈমান

ইসলামের মৌলিক ছয়টি বিশ্বাসের অন্যতম হলো কেয়ামত দিবসে ঈমান আনা। এ বিশ্বাস একজন মুসলমানের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। কেয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান মানে হচ্ছে, এই বিশ্বাস রাখা যে একদিন এ পৃথিবী ধ্বংস হবে এবং সকল মানুষ আল্লাহর সামনে পুনরুত্থিত হয়ে তাদের আমলের জবাবদিহি করবে। এই বিশ্বাস মানুষকে সৎ পথে চলতে এবং গোনাহ থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করে।

কেয়ামতের অর্থ ও তাৎপর্য: 'কেয়ামত' শব্দটি আরবি 'قِيَامَة' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো 'উঠে দাঁড়ানো' বা 'পুনরুত্থান'। ইসলামিক পরিভাষায় কেয়ামত হলো সেই দিন, যেদিন আল্লাহ পৃথিবীর সমস্ত জীবিত ও মৃত মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদের আমল অনুযায়ী বিচার করবেন।

কেয়ামতের প্রতি ঈমানের গুরুত্ব:কেয়ামতের প্রতি ঈমান রাখা ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের একটি। কোরআন ও হাদীসে অসংখ্যবার কেয়ামতের আলোচনা এসেছে। এই বিশ্বাস মানুষকে আমলদার, চরিত্রবান এবং আত্মনিয়ন্ত্রণকারী করে তোলে। এটি মানুষের অন্তরে আল্লাহীতি সৃষ্টি করে এবং অন্যায় থেকে বিরত রাখে।

আল্লাহ বলেন:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ — সেই ব্যক্তির জন্য, যে আল্লাহ ও কিয়ামতের দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব,

আয়াত ২১)

কেয়ামতের দিন সম্পর্কে কোরআনের বর্ণনা:কোরআনুল কারিমে কেয়ামতের দিনকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়েছে, যেমন:

ইয়াওমুল কিয়ামাহ (পুনরুত্থানের দিন)

ইয়াওমুদ্দীন (বিচারের দিন)

আস-সা'আহ (ঘণ্টা/মুহূর্ত)

আল-হাক্কাহ (সত্য ঘটনাবলি)

আল-গাশিয়াহ (আচ্ছাদনকারী)

আয-যিলযাল (ভূমিকম্প)

এই নামগুলো কেয়ামতের ভয়াবহতা ও গুরুত্ব বোঝায়।

কেয়ামতের লক্ষণসমূহ:কেয়ামতের আগে কিছু ছোট ও বড় আলামত প্রকাশ পাবে। ছোট আলামতের অনেকগুলো ইতিমধ্যে ঘটেছে।

কিছু ছোট আলামত:আমানতের খেয়ানত,জ্ঞান হ্রাস পাওয়া,নারী-পুরুষের অনৈতিক সম্পর্ক,মাতালতা, গান-বাজনা বৃদ্ধি,বড় আলামত,ইমাম মাহদির আগমন,দাজ্জালের আবির্ভাব,ঈসা (আ.)-এর অবতরণ,ইয়াজুজ-মাজুজের উত্থান,সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া

কেয়ামতের দিন কীভাবে শুরু হবে:কেয়ামতের দিন শুরু হবে সুর ইসরাফিলের ফুঁ দ্বারা। ইসরাফিল (আ.) সুর ফুঁকবেন, যার ফলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয়বার সুর ফুঁকলে সবাই পুনরায় জীবিত হবে এবং আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

হাশর ও বিচার দিবস:কেয়ামতের পরে মানুষকে ময়দানে হাশরে একত্র করা হবে। সেখানে মানুষের আমলনামা দেওয়া হবে। আমলনামা ডান হাতে পেলে সে জান্নাতি, আর বাঁ হাতে পেলে সে জাহান্নামি।

আল্লাহ বলেন:

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

“অতএব যাকে তার ‘আমলনামা’ ডান হাতে দেওয়া হবে” (সূরা হাক্কাহ, আয়াত -১৫)

মিজান ও সিরাত:মিজান আমলের পাল্লা। সৎকর্ম ও পাপ এক পাল্লায় ওজন করা হবে।

সিরাত: একটি সূক্ষ্ম সেতু যা জাহান্নামের ওপর দিয়ে জান্নাতের দিকে যাবে। মু’মিনগণ আলোর গতিতে পার হবে, আর কাফিরগণ পড়ে যাবে।

কেয়ামতের বিশ্বাস মানুষকে সৎ জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করে। এটি মানুষকে আত্মসংযমী, ধৈর্যশীল, উদার এবং আল্লাহভীরু করে তোলে। কেউ যদি জানে, একদিন তাকে জবাবদিহি করতে হবে, সে কখনও অন্যায় কাজ করতে পারে না।

কেয়ামতের দিন নবীজির (সা.) শাফাআত:রাসূল (সা.) কেয়ামতের দিন তাঁর উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। তাঁকে “আল-মাকামুল মাহমুদ” (প্রশংসিত মর্যাদা) দেওয়া হবে। মুসলিমদের জন্য এটি এক আশার আলো।

পরিণতি: জান্নাত ও জাহান্নাম:কেয়ামতের বিচার শেষে মানুষ জান্নাত বা জাহান্নামে যাবে। যারা আল্লাহ ও রাসূলের অনুসরণ করেছে, তারা জান্নাতে যাবে। আর যারা অস্বীকারকারী ও পাপাচারী, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

কেয়ামতের ওপর ঈমান রাখা শুধু একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং এটি একজন মুসলমানের চিন্তা, মনোভাব ও আচরণের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। যারা কেয়ামতের দিনকে স্মরণ করে চলে, তারা আল্লাহভীরু ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়। তাই আমাদের উচিত কেয়ামতের প্রতি দৃঢ় ঈমান।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কেয়ামতের দিন ঈমানসহ হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমিন।

তাকদিরের ওপর ঈমান

ইসলামে ঈমান বা বিশ্বাসের ছয়টি মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো তাকদিরে ঈমান – অর্থাৎ ভাল-মন্দ সব কিছুই আল্লাহর নির্ধারিত, তাঁর ইচ্ছা ও জ্ঞানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। একজন মুসলমানের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হয় না যতক্ষণ না সে তাকদিরে বিশ্বাস করে।

তাকদিরের সংজ্ঞা:তাকদির (القدر) আরবি শব্দ যার অর্থ মাপজোখ, পরিমাণ, নির্ধারণ ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় তাকদির হলো:

“আল্লাহ তা’আলা সৃষ্টির সকল ঘটনার জ্ঞান, সেগুলোর পূর্বনির্ধারণ, এবং সময় অনুযায়ী তা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতার নাম তাকদির।”

তাকদিরে ঈমানের গুরুত্ব:তাকদিরে ঈমান রাখা প্রতিটি মুসলমানের জন্য আবশ্যিক। রাসূল (সা.) বলেন:

“তুমি ঈমান এনেছো কিনা?”

সে বলল: "হ্যাঁ, আমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রাসুল, কিয়ামতের দিন এবং তাকদিরের ওপর ঈমান এনেছি – ভালো হোক বা মন্দ হোক।" (সহীহ মুসলিম)

তাকদিরে ঈমানের চারটি স্তর:

১. আল-ইলম (الْعِلْم) – জ্ঞান

আল্লাহ সর্ববিষয়ে পূর্ব থেকেই জানেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সব কিছুই আল্লাহর জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

২. আল-কিতাবাহ (الْكِتَابَة) – লিপিবদ্ধকরণ

আল্লাহ তায়ালা সব কিছু লোহে মাহফুজ-এ লিখে রেখেছেন।

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
"নিশ্চয়ই আমিই মৃতদেরকে জীবিত করি এবং তারা যা অগ্রে পাঠিয়েছে ও যা তাদের চিহ্ন হিসাবে রয়েছে তা লিখে রাখি, আর সব কিছুই আমি সুস্পষ্ট কিতাবে লিখে রেখেছি।" (সূরা

ইয়াসিন, আয়াত ১২)

৩. আল-মশিয়াহ (الْمَشِيئَة) – ইচ্ছা

আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছুই ঘটে না।

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

“তোমরা যা চাও, তা আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত চাও না; তিনিই বিশ্বজগতের প্রতিপালক”। (সূরা

তাকভীর: ২৯)

৪. আল-খালক (الْخَلْق) – সৃষ্টি

আল্লাহই প্রত্যেকটি কাজের স্রষ্টা। মানুষের আমলও আল্লাহর সৃষ্টি, যদিও মানুষকে ইচ্ছা ও স্বাধীনতা দিয়েছেন।

মানবের ইচ্ছা ও তাকদির:তাকদিরে বিশ্বাস মানে এই নয় যে, মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী নয়। বরং, আল্লাহ মানুষকে বুদ্ধি, জ্ঞান ও ইচ্ছা দিয়েছেন। তাই কেউ ভালো কাজ করলে সে পুরস্কৃত হবে এবং খারাপ করলে শাস্তি পাবে। কুরআনে আল্লাহ বলেন:

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ لِّلْع

"যে সৎকর্ম করে, সে তা করে নিজেরই উপকারের জন্য, আর যে মন্দ কাজ করে, তার ক্ষতিও তার নিজেরই ওপর বর্তায়। আপনার প্রতিপালক কখনও বান্দাদের প্রতি জুলুমকারী নন।" (সূরা ফুসসিলাত: ৪৬)

তাকদিরে বিশ্বাসের উপকারিতা:

১. সন্তুষ্টি ও ধৈর্য-যে ব্যক্তি তাকদিরে বিশ্বাস করে, সে জীবনের প্রতিটি অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকে।

২. হিংসা ও অহংকার থেকে মুক্তি-যে জানে রিজিক আল্লাহর নির্ধারিত, সে অন্যের সফলতায় হিংসা করে না।

৩. আত্মবিশ্বাস ও সাহসিকত-তাকদিরে বিশ্বাস ব্যক্তি-মানসে সাহস ও শক্তি যোগায়। মৃত্যুভয়, লোকের ভয় ইত্যাদি কমে যায়।

ভুল ধারণাসমূহ:

১. "তাকদির আছে, তাই চেষ্টা করে লাভ কী?"

এটি ভুল ধারণা। তাকদিরে বিশ্বাস করার অর্থ এই নয় যে চেষ্টা বৃথা। বরং, ইসলাম চেষ্টা ও দোয়ার আদেশ দিয়েছে।

২. "আমি গুনাহ করছি কারণ তাকদিরে লেখা আছে।"

আল্লাহ কাউকে গুনাহ করতে বাধ্য করেন না। আপনি নিজের ইচ্ছায় পাপ করছেন।

তাকদিরে বিশ্বাস না করলে কী হয়?

রাসূল (সা.) বলেন:

"তাকদিরে ঈমান না রাখা এই উম্মতের মধ্যেও কুফরি বলে বিবেচিত হবে।" (আবু দাউদ)

তাকদিরে অবিশ্বাস করা আল্লাহর জ্ঞান ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করার নামান্তর।

উদাহরণ দিয়ে বুঝানো: ধরা যাক, একজন কৃষক বীজ বপন করল। সে বৃষ্টির জন্য দোয়া করল, যত্ন নিল। এরপরও যদি ফসল না হয়, তবে সে বলে: "আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, সেটাই হয়েছে।" এটি তাকদিরে বিশ্বাস।

কিন্তু কেউ যদি বলে: "আল্লাহ যা নির্ধারণ করেছেন, সেটাই হবে, তাই আমি কিছু করব না"—এটা ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল।

তাকদিরে ঈমান ইসলামের একটি অপরিহার্য বিশ্বাস। এটি মানুষকে দায়িত্বশীলতা, ধৈর্য, আশা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং দৃঢ় ঈমানের পথে পরিচালিত করে। আমাদের উচিত, আল্লাহর নির্ধারণে বিশ্বাস রেখে সদা চেষ্টা করে যাওয়া এবং সর্বদা তাঁর প্রতি ভরসা রাখা।

সরাসরি কোরআন ও হাদিস থেকে কিছু উদ্ধৃতি:

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ۖ

"নিশ্চয়ই, আমি প্রতিটি বস্তু পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি।" (সূরা আল-কামার: ৪৯)

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَاهُ حَسَنًا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"যার জন্য তার মন্দ কাজকে শোভন করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে তা ভালো মনে করে— তাহলে (সে কি সৎপথে থাকা ব্যক্তির সমান)? নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব, আপনি তাদের জন্য দুঃখে নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালোভাবে জানেন তারা যা করছে।" (সূরা

ফাতির, আয়াত ৮)

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"তোমাদের জন্য যুদ্ধ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের অপছন্দনীয়। কিন্তু হতে পারে, তোমরা এমন কিছু অপছন্দ করো যা তোমাদের জন্য ভালো, এবং এমন কিছু ভালোবাসো যা তোমাদের জন্য মন্দ। আল্লাহ জানেন, অথচ তোমরা জানো না"। (সূরা বাকার:

২১৬)

পুনরুত্থানের ওপর ঈমান

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মূল ভিত্তি ছয়টি ঈমানের রুকন বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন হলো "কিয়ামত বা পুনরুত্থানের উপর ঈমান"। অর্থাৎ, এই বিশ্বাস রাখা যে মৃত্যুর পর একদিন সমস্ত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে আল্লাহ তাদেরকে বিচারের জন্য উপস্থিত করবেন। এটি কেবল একটি ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, বরং এটি মানব জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধের গভীর ভিত্তি গড়ে তোলে।

পুনরুত্থান কী?

‘পুনরুত্থান’ শব্দের অর্থ হলো পুনরায় জীবিত হওয়া। ইসলামী পরিভাষায়, পুনরুত্থান বলতে বোঝানো হয়, মৃত্যু পরবর্তী এক বিশেষ দিন—কিয়ামতের দিন, যেদিন আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানবজাতিকে কবর থেকে পুনরুজ্জীবিত করবেন এবং তাদের দুনিয়ার কর্মের হিসাব নেবেন। কুরআন ও হাদীসে এই বিষয়ে বহুবার আলোচনা করা হয়েছে।

পুনরুত্থানে বিশ্বাস কেন জরুরি?

১. ঈমানের অংশ-পুনরুত্থানের উপর ঈমান রাখা ছয়টি ঈমানের মৌলিক স্তম্ভের একটি। কেউ যদি এতে বিশ্বাস না করে, তবে তার ঈমান পূর্ণাঙ্গ নয়।

২. আখিরাতের জবাবদিহিতা-এই বিশ্বাস মানুষকে ন্যায়পরায়ণ ও সতর্ক জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে। সে জানে, প্রতিটি কাজের জন্য তাকে আল্লাহর কাছে জবাব দিতে হবে।

৩. আশা ও ভয়ের ভারসাম্য-জান্নাতের আশায় এবং জাহান্নামের ভয়ে মানুষ ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী হয় এবং পাপ কাজ থেকে বিরত থাকে।

কুরআনে পুনরুত্থানের আলোচনা:পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে কিয়ামতের দিন, পুনরুত্থান এবং পরকাল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন:

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

"সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে"। (সূরা আনআল:আয়াত-১০৪)

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝

"আর যখন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে আসবে"। (সূরা ইয়াসিন:আয়াত-৫১)

হাদীসে পুনরুত্থানের বর্ণনা:রাসূলুল্লাহ ﷺ অসংখ্য হাদীসে কিয়ামতের দিন ও পুনরুত্থান সম্পর্কে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন:

সাহাবীদের প্রশ্ন:

সাহাবীরা রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করতেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিয়ামতের দিন কীভাবে হবে?" তখন তিনি পুনরুত্থানের বিবরণ দিতেন — মানুষ নগ্ন অবস্থায় উঠবে, সূর্য খুব কাছে থাকবে, মানুষ ঘামে ভিজে যাবে ইত্যাদি।

হাশর ও মীযানের আলোচনা:হাশরের মাঠে সকলকে একত্রিত করা হবে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির আমলের হিসাব নেওয়া হবে মীযানের মাধ্যমে।

পুনরুত্থানের ধাপসমূহ:

১. ইস্রাফীলের শিঙ্গা ফুঁকানো
২. সৃষ্টির ধ্বংস (প্রথম ধ্বংস)
৩. সকল মৃতের পুনরুজ্জীবন (দ্বিতীয় শিঙ্গা)
৪. হাশর বা জমায়েত
৫. হিসাব কিতাব (Amal-nama)
৬. মীযান (আমল মাপার পাল্লা)
৮. সিরাত সেতু অতিক্রম
৮. জান্নাত বা জাহান্নামে গমন

পুনরুত্থানে অবিশ্বাসীদের যুক্তির জবাব:অনেকে মনে করে যে, মানুষ মাটির সাথে মিশে গেলে কীভাবে আবার জীবিত হবে? এ বিষয়ে কুরআনে আল্লাহ বলেন:

أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۝

"মানুষ কি দেখে না (এবং চিন্তা করে না) যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি বীৰ্য থেকে? অতঃপর সে স্পষ্ট প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে"। (সূরা ইয়াসিন:আয়াত- ৩৬)

যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে পারেন, তার জন্য পুনরায় সৃষ্টি করা কঠিন কীভাবে হতে পারে? আধুনিক বিজ্ঞান ও পুনরুত্থান:বর্তমান যুগে ক্লোনিং, ডিএনএ, মেমরি ট্রান্সফার ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের মৃত কোষ থেকেও জীবনের ছাপ পাওয়ার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে। যদিও ইসলাম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাসের বিষয়, তবে এগুলো আখিরাতের ঘটনাকে কল্পনার বাইরে নিয়ে যায় না।

আমাদের কর্তব্য কী?

আমরা যেন পুনরুত্থানের দৃঢ় বিশ্বাস রাখি।প্রতিনিয়ত নিজের আমল ঠিক রাখার চেষ্টা করি।আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে দূরে থাকি এবং উত্তম চরিত্র গঠন করি।

পুনরুত্থানে বিশ্বাস একজন মুসলমানের জীবনে পরিবর্তন আনে। এটি মানুষকে আল্লাহভীরু, ন্যায়পরায়ণ এবং দায়িত্ববান করে তোলে। এই বিশ্বাস ছাড়া একজন মুসলমান পূর্ণাঙ্গ নয়। তাই আমাদের উচিত, এই বিশ্বাসকে অন্তরে স্থান দিয়ে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলা।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ আয়াত:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ۖ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
"তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা ছিলে মৃত, অতঃপর তিনি তোমাদের জীবন দান করেছেন, এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেবেন, তারপর তোমাদের পুনরায় জীবিত করবেন, তারপর তোমরা তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে।" (সূরা আল-বাকার, আয়াত ২৮)

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ
“আর নিঃসন্দেহে কিয়ামত আসবেই — এতে কোন সন্দেহ নেই। এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ কবরস্থ সব মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন।” (সূরা হজ্জ, আয়াত ৭)

فَلْيُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ
বলুন, “যিনি একবার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই একে পুনরায় জীবিত করবেন। তিনি সব সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান রাখেন।” (সূরা ইয়াসিন :আয়াত-৭৯)

পুনরুত্থানে বিশ্বাস রাখা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ রুকন।কুরআন-হাদীসে এর ব্যাপক আলোচনা আছে।এটি মানুষের নৈতিক উন্নতি ও আল্লাহভীতি সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ।কিয়ামতের দিন বিচার হবে এবং চূড়ান্ত পুরস্কার/শাস্তি দেয়া হবে

তাকওয়া

মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করা। এই লক্ষ্য অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। তাকওয়া হলো এমন এক অভ্যন্তরীণ গুণ, যা মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি, আনুগত্য, আত্মসংযম ও নৈতিকতার সমন্বয় ঘটায়। প্রকৃতপক্ষে তাকওয়াই মানুষকে আল্লাহর সৃষ্ট অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করে তোলে, কারণ অন্য প্রাণী শুধু প্রবৃত্তির উপর ভিত্তি করে চলে; কিন্তু মানুষকে আল্লাহ দিয়েছেন বিবেক, জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ। আর সেই দায়িত্ববোধের সর্বোচ্চ প্রকাশই হলো তাকওয়া।

কোরআনুল কারীমে আল্লাহ বহুবার তাকওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক মর্যাদাশালী, যে অধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও সবকিছুর খবর রাখেন।” (সূরা হুজরাত: ১৩)

অর্থাৎ, বংশ, সম্পদ বা পদমর্যাদার উপর ভিত্তি করে কারো সম্মান আল্লাহর কাছে নির্ধারিত হয় না; বরং তাকওয়ার মাত্রাই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণ করে।

তাকওয়া কেবল নামাজ, রোজা, যাকাত বা হজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—আচার-আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, সমাজ, এমনকি একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও তাকওয়ার প্রতিফলন ঘটতে হয়। এ কারণেই ইসলামের শিক্ষায় তাকওয়া এমন একটি সমন্বিত জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার দিকে নিয়ে যায়।

তাকওয়া ছাড়া মানুষের ঈমান অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ, শুধু মুখে ঈমান আনার পরও যদি মানুষ আল্লাহর ভয়কে অন্তরে ধারণ না করে, তবে সে সহজেই গুনাহ ও অবাধ্যতার পথে চলে যেতে পারে। তাই তাকওয়া হলো ঈমানের রক্ষাকবচ এবং ইসলামী জীবনের মূল স্তম্ভ।

তাকওয়ার সংজ্ঞা ও অর্থ: আরবি উৎস: তাকওয়া শব্দটি এসেছে আরবি “وَقَايَةً” (উইকায়াহ) থেকে, যার অর্থ হলো রক্ষা করা, বাঁচানো বা আড়াল করা। অর্থাৎ তাকওয়া মানে হলো—নিজেকে আল্লাহর গজব ও শাস্তি থেকে রক্ষা করা।

পরিভাষায়: তাকওয়া হলো আল্লাহকে ভয় করে তাঁর আদেশ পালন করা এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

সহজভাবে: যা আল্লাহ করেছেন ফরয, তা আদায় করা। যা করেছেন হারাম, তা থেকে বিরত থাকা। সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকা। জীবনকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরিচালনা করা।

তাকওয়া মানে হলো—আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসায় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর আনুগত্যের মধ্যে জীবন যাপন করা।

কোরআনে তাকওয়ার গুরুত্ব

মানব জীবন এক অমূল্য আমানত। এই জীবনকে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন সঠিক দিকনির্দেশনা। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তাঁর ইবাদতের জন্য এবং উত্তম পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। এ জীবনে মানুষকে দুই পথের সামনে দাঁড় করানো হয়েছে—একটি হলো সৎপথ, যা জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়; অন্যটি হলো অন্যায় ও পাপের পথ, যা জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। মানুষ যাতে সঠিক পথ বেছে নিতে পারে, সে জন্য আল্লাহ তাঁর কিতাবসমূহ নাজিল করেছেন, নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, আর তাদের সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা হলো মহাগ্রন্থ আল-কোরআন।

কোরআনের বার্তা ও নবী করিম ﷺ এর শিক্ষা অনুযায়ী, মানুষের জীবনে সাফল্যের মূলভিত্তি হলো তাকওয়া। তাকওয়া হলো সেই ঢাল, যা মানুষকে পাপাচার থেকে রক্ষা করে; তাকওয়া হলো সেই আলো, যা মানুষকে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে শেখায়। কেবল নামায-রোজা বা বাহ্যিক আমল নয়, বরং মানুষের অন্তর, চিন্তা, নৈতিকতা ও সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অপরিহার্য।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে অসংখ্যবার তাকওয়ার গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে তাকওয়াই মানুষের প্রকৃত মর্যাদার মাপকাঠি। জাতি, বংশ, ধন-সম্পদ বা পদমর্যাদা নয়; বরং যিনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করেন এবং তাঁর আদেশ মানেন, তিনিই আল্লাহর কাছে সম্মানিত।

তাকওয়া মানুষের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে উভয় দিক থেকেই কল্যাণ বয়ে আনে। দুনিয়াতে এটি মানুষকে অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি ও অনৈতিক জীবন থেকে বিরত রাখে। আর আখিরাতে এটি জান্নাত লাভের চাবিকাঠি হয়ে ওঠে। কোরআনকে প্রকৃত হেদায়েত হিসেবে গ্রহণ করতে হলে অন্তরে তাকওয়া থাকতে হয়। এমনকি জীবনের প্রতিটি সংকটে, দুঃখ-কষ্টে, বিপদাপদে তাকওয়াই মানুষের জন্য আল্লাহর সাহায্য ও মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত করে।

অতএব, মুসলমানের জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। একজন প্রকৃত মুমিন তখনই পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হতে পারে, যখন সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়া আঁকড়ে ধরে। দুনিয়ার সফলতা, আখিরাতে মুক্তি এবং আল্লাহর নৈকট্য—সবকিছুর জন্য তাকওয়া অপরিহার্য।

কোরআনে তাকওয়ার গুরুত্ব:

১. তাকওয়া হলো জীবন পরিচালনার মূলনীতি:

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো (তাকওয়া অবলম্বন করো) যেমন ভয় করার অধিকার তাঁর, আর তোমরা যেন মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।” (সূরা আলে ইমরান, আয়াত

১০২)

এখানে তাকওয়াকে জীবনভর আঁকড়ে ধরার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এটি শুধু আংশিক আমল নয়, বরং সার্বিক জীবনব্যবস্থা।

২. তাকওয়াবানদের জন্য কোরআন হেদায়েত:

আল্লাহ বলেন:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“এ সেই কিতাব (আল-কুরআন), এতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি মুতাকীদের (আল্লাহ-ভীরুদের) জন্য হিদায়াত।” (সূরা আল-বাক্বার, আয়াত ২)

অর্থাৎ কোরআন থেকে প্রকৃত উপকার লাভ করে সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে তাকওয়া বিদ্যমান।

৩. তাকওয়া আল্লাহর সাহায্যের কারণ:

আল্লাহ বলেন:

اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল।”

(সূরা নাহল - আয়াত ১২৮)

যে আল্লাহর সাহায্য ও সঙ্গী লাভ করে, তার জন্য ভয় বা হতাশার কিছু নেই।

৪. তাকওয়া বিপদে মুক্তির পথ:

আল্লাহ বলেন:

وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝۳

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে), তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেন।”

“আর তাকে এমন জায়গা থেকে রিজিক দেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তাঁর জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করেন। আল্লাহ তো প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক করে দিয়েছেন।” (সূরা তালাক:

২-৩)

এ আয়াত প্রমাণ করে যে তাকওয়া শুধু আখিরাত নয়, দুনিয়ার সমস্যা সমাধানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. তাকওয়াবানদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত:

আল্লাহ বলেন:

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
 “আর তোমরা দৌড়ে চলো তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে,
 যার প্রস্থ আসমান ও জমিনের সমান; যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।” (সূরা আলে ইমরান:

১৩৩)

অর্থাৎ চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিবাসী হবেন সেইসব মানুষ, যারা তাকওয়ার জীবন যাপন করে।
 কোরআনের আলোকে বোঝা যায়, তাকওয়া ছাড়া ইসলাম পূর্ণ হয় না। তাকওয়া হলো
 আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, মানবতার আসল মর্যাদা, দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার
 মূল চাবিকাঠি। তাই প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হলো—নিজেকে তাকওয়ার পথে গড়ে তোলা,
 হারাম ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা, এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যে জীবন কাটানো।

হাদিসে তাকওয়ার গুরুত্ব

মানব জীবনের মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ
 করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য ইসলাম যে নীতি, আদর্শ ও জীবনপদ্ধতি প্রণয়ন করেছে
 তার কেন্দ্রে রয়েছে তাকওয়া। এই তাকওয়ার ভেতরেই লুকিয়ে আছে মানুষের অন্তরের
 শুদ্ধতা, কর্মের সততা এবং আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ভয়-ভালোবাসা। তবে তাকওয়া কেবল
 একটি সাধারণ নীতি নয়; এটি এমন এক পরিপূর্ণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থা যা মানুষের
 চিন্তা, চরিত্র ও জীবনযাত্রাকে আমূল পরিবর্তন করে।

"হাদিসে তাকওয়া" শব্দের তাৎপর্য: "হাদিসে তাকওয়া" বলতে বোঝানো হয় তাকওয়ার
 উৎকৃষ্টতম রূপ বা তাকওয়ার পরিপূর্ণ চর্চা। সাধারণ তাকওয়া হলো গুনাহ থেকে বাঁচা,
 আল্লাহর বিধান মেনে চলা এবং হারাম থেকে বিরত থাকা। কিন্তু হাদিসে তাকওয়া হলো
 এমন এক উন্নত স্তর যেখানে মানুষ কেবল হারাম থেকে নয়, বরং সন্দেহজনক বিষয় থেকেও
 বেঁচে থাকে; যেখানে সে দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ আসনে
 স্থান দেয়।

একজন সাধারণ মুসলিমের জন্য তাকওয়া আবশ্যিক হলেও একজন প্রকৃত মুত্তাকির বৈশিষ্ট্য
 হলো হাদিসে তাকওয়া। ইমাম গাজ্জালি (রহ.) বলেছেন:

“তাকওয়ার চার স্তর রয়েছে: (১) কুফর থেকে বেঁচে ইসলাম গ্রহণ করা, (২) বড় গুনাহ
 থেকে বিরত থাকা, (৩) ছোট গুনাহ থেকেও সতর্ক থাকা, (৪) দুনিয়ার এমন কিছু থেকেও
 বেঁচে থাকা যা অন্তরের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়।”

চতুর্থ স্তরই প্রকৃত অর্থে হাদিসে তাকওয়া।

ইসলামে তাকওয়ার অবস্থান: ইসলাম মানুষের জীবনকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের জন্য
 সুন্দর করতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু এ সৌন্দর্যের শর্ত হলো তাকওয়া। তাকওয়া ছাড়া

ইমানের পূর্ণতা আসে না, ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় না, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। এমনকি আল্লাহর দয়া ও রহমতের যোগ্য হতে হলেও তাকওয়া অপরিহার্য। অর্থাৎ সাধারণ ভয় নয়, বরং এমন ভয় যা মানুষের অন্তরকে জাগ্রত রাখে, প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজে। এটাই হলো হাদিসে তাকওয়ার প্রকৃত ব্যাখ্যা।

কেন হাদিসে তাকওয়ার প্রয়োজন: আজকের যুগে মানুষ জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সভ্যতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু নৈতিকতা, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে আমরা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছি। আধুনিক সমাজে ভোগবাদ, অর্থলোভ, প্রতারণা, দুর্নীতি, অবক্ষয়, নৈতিক সঙ্কট—সবকিছুই ক্রমবর্ধমান। এই পরিস্থিতিতে কেবল সাধারণ তাকওয়া যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন হাদিসে তাকওয়া, অর্থাৎ উচ্চতর স্তরের তাকওয়া।

হাদিসে তাকওয়া মানুষকে শুধু গুনাহ থেকে দূরে রাখে না, বরং তাকে সত্যিকারের আল্লাহভীরু, আখিরাতমুখী এবং সামাজিকভাবে কল্যাণকামী ব্যক্তি হিসেবে গড়ে তোলে।

কোরআন ও হাদিসে ইঙ্গিত: নবী করিম (সা.) বলেছেন,

“সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকো, কারণ সন্দেহ পাপের দিকে নিয়ে যায়।” (সহীহ

বুখারী, সহীহ মুসলিম)

এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, সাধারণ তাকওয়া হারাম থেকে বাঁচতে শেখায়, কিন্তু হাদিসে তাকওয়া মানুষকে সন্দেহজনক ও ক্ষুদ্রতম খারাপ থেকেও বিরত থাকতে শেখায়।

সুতরাং হাদিসে তাকওয়া হলো মুসলমানের জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ। এটি শুধু একটি ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং একটি সমন্বিত জীবনদর্শন—যা মানুষের অন্তর, চিন্তা, নৈতিকতা, ইবাদত ও সমাজজীবনকে আলোর পথে পরিচালিত করে। মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণ, শান্তি ও অগ্রগতির একমাত্র ভিত্তি হলো এই হাদিসে তাকওয়া।

হাদিসে তাকওয়ার বৈশিষ্ট্য:

১. আন্তরিকতার বিশুদ্ধতা – প্রতিটি কাজে আল্লাহর জন্য নিয়ত করা।
 ২. পাপ থেকে পরিপূর্ণ বিরত থাকা – হারাম তো বটেই, সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকা।
 ৩. দুনিয়ার মোহ থেকে মুক্তি – অর্থ, পদমর্যাদা, খ্যাতি প্রভৃতি জীবনের লক্ষ্য না হওয়া।
 ৪. আল্লাহর ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার – আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুকে মূল্য না দেওয়া।
 ৫. সততা ও নৈতিক দৃঢ়তা – যে কোনো প্রলোভন, ভয় বা চাপের মুখেও সৎ থাকা।
- ইমাম আবু হানিফা (রহ.) : ব্যবসায় একটি কাপড়ের ত্রুটি জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন, তাই পুরো কাপড়ের গুদাম দান করে দিলেন।

আধুনিক যুগে হাদিসে তাকওয়া:বর্তমান সমাজে মানুষকে প্রতিনিয়ত নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। প্রযুক্তি, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া, ভোগবাদী জীবনধারা মানুষকে গুনাহের দিকে টেনে নিচ্ছে। এই সময়ে হাদিসে তাকওয়া ছাড়া ঈমান অটুট রাখা কঠিন।

যুব সমাজ যদি হাদিসে তাকওয়ার শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে তারা হবে—সততার প্রতীক, দুর্নীতিমুক্ত নেতা, সমাজ সংস্কারক, শক্তিশালী প্রজন্ম।

হাদিসে তাকওয়ার ফলাফল:

ব্যক্তিগত জীবন : শান্তি, স্থিরতা, ঈমানের দৃঢ়তা।

পারিবারিক জীবন : ভালোবাসা, আস্থা, দায়িত্ববোধ।

সামাজিক জীবন : দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ন্যায়বিচার, মানবতা।

আখিরাতে : জান্নাতের নিশ্চয়তা, আল্লাহর সান্নিধ্য।

আল্লাহ বলেন—

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ
الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ
ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمُ تُحْبَرُونَ

“হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোনো ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না।

যারা আমার আয়াতসমূহে ঈমান এনেছিল এবং মুসলিম ছিল।

তোমরা ও তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে প্রবেশ করো; সেখানে তোমরা আনন্দিত হবে।” (সূরা আয-

যুখরুফ: ৬৮-৭০)

হাদিসে তাকওয়ার অনুপস্থিতির ক্ষতি:যদি মানুষের মাঝে হাদিসে তাকওয়া না থাকে, তবে—
ব্যক্তিগত জীবনে অস্থিরতা ও অশান্তি নেমে আসে। পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়। সমাজ দুর্নীতি,
প্রতারণা, লোভ, অবক্ষয়ে ডুবে যায়। আখিরাতে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়।

সুতরাং “হাদিসে তাকওয়া” কোনো বিলাসী ধারণা নয়; এটি মুসলিম জীবনের মূল ভিত্তি।

সাধারণ তাকওয়া মানুষকে নামমাত্র মুসলমান বানায়, কিন্তু হাদিসে তাকওয়া মানুষকে প্রকৃত মুত্তাকি বানায়। সমাজের উন্নতি, নৈতিকতার পুনর্জাগরণ, আল্লাহর রহমত ও আখিরাতে মুক্তি—সবকিছুর মূল চাবিকাঠি হলো এই হাদিসে তাকওয়া।

মুসলিম উম্মাহ যদি আবার পৃথিবীতে মর্যাদাবান হতে চায়, তবে তাদের ফিরে যেতে হবে তাকওয়ার উচ্চতম স্তরে—হাদিসে তাকওয়ার পথে।

তাকওয়ার স্তরসমূহ

ইসলামিক দৃষ্টিতে তাকওয়া একটি আধ্যাত্মিক গুণ, যার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহকে ভয় করে, তাঁর আদেশ মানে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকে। কোরআন ও হাদিসে তাকওয়ার বিভিন্ন

স্তরের কথা পাওয়া যায়। সাধারণভাবে আলেমগণ তাকওয়াকে কয়েকটি ধাপে ভাগ করেছেন—যাতে বোঝা যায়, একজন মুমিন ধীরে ধীরে উন্নত পর্যায়ে যেতে পারে।

প্রথম স্তর: হারাম থেকে বেঁচে থাকা---এটি তাকওয়ার মূল ভিত্তি। একজন মুমিন যদি আল্লাহকে ভয় করে হারাম কাজগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারে, তাহলে সে তাকওয়ার প্রথম ধাপে প্রবেশ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি, তা থেকে বিরত থাকো। আর যা করার নির্দেশ দিয়েছি, তা তোমরা যথাসাধ্য পালন করো।” (সহিহ মুসলিম)

চুরি, খুন, জিনা, মদপান, সুদখোরি ইত্যাদি বড় গুনাহ থেকে বিরত থাকা। নামাজ না পড়া হারাম, তাই সচেতনভাবে নামাজ আদায় করা। তাকওয়ার এই স্তর না থাকলে অন্য সব স্তর অর্থহীন হয়ে যায়। এটি ইসলামের মৌলিক কাঠামো।

দ্বিতীয় স্তর: সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকা---যে বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে হালাল বা হারাম নয়, বরং মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে (মুশতাবিহাত বা সন্দেহজনক বিষয়), তাকওয়াদার মানুষ সেগুলো থেকেও বিরত থাকে, যাতে হারামে না পড়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“হালাল বিষয় সুস্পষ্ট, হারাম বিষয়ও সুস্পষ্ট। আর এ দুয়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে, যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে দূরে থাকে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জত রক্ষা করে।” (সহিহ বুখারি, মুসলিম)

কোনো সম্পদের উৎস নিশ্চিত না হলে, তা ভক্ষণ থেকে বিরত থাকা। ব্যবসায় লাভ বৈধ হলেও যদি সন্দেহ থাকে প্রতারণা হয়েছে কিনা, তবে সেটি না নেওয়া কে “ইহতিয়াতি তাকওয়া” বলা হয়। এটি বান্দাকে ভুল-ত্রুটি থেকে বাঁচায়।

তৃতীয় স্তর: মুবাহ বিষয় থেকেও বিরত থাকা, যদি তা গুনাহের দিকে নিয়ে যায়---ইসলামে কিছু কাজ অনুমোদিত (মুবাহ), তবে অতিরিক্ত করলে তা গুনাহ বা গাফেলতির কারণ হতে পারে। তাকওয়ার এ স্তরে মানুষ এসব থেকেও বেঁচে থাকে।

বৈধ খাবার অতিরিক্ত খেলে আলস্য হয়, নামাজে ব্যাঘাত ঘটে---তাই এড়ানো। বৈধ বিনোদন হলেও অতিরিক্ত সময় নষ্ট করলে তা ত্যাগ করা। হযরত হাসান আল বসরী (রহ.) বলেছেন—“তাকওয়াদাররা অনেক হালাল বিষয়ও ত্যাগ করতেন, যাতে হারামের আশঙ্কা না হয়।” এটি আত্ম-সংযমের স্তর। যারা এ ধাপে ওঠে, তাদের অন্তরে আল্লাহভীতি দৃঢ়ভাবে বসে যায়।

চতুর্থ স্তর: অন্তরের তাকওয়া---এ স্তরে মানুষ শুধু বাহ্যিক গুনাহ থেকে নয়, বরং হৃদয়ের রোগ থেকেও নিজেকে মুক্ত রাখে। কারণ হৃদয়ের পাপ বাহ্যিক পাপের চেয়েও ভয়ংকর।

অহংকার, হিংসা, লোভ, রিয়া (লোক দেখানো), বিদ্বেষ প্রভৃতি থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখা।

অন্তরের তাকওয়া ছাড়া প্রকৃত তাকওয়া পূর্ণ হয় না। এটি ইহসানের পর্যায়।

পঞ্চম স্তর: আল্লাহর মহব্বত ও নৈকট্য অর্জনের তাকওয়া---এটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। এখানে মানুষ শুধু আল্লাহর শাস্তির ভয় থেকে নয়, বরং আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রতিটি কাজ করে।

নফল ইবাদত (তাহাজ্জুদ, রোজা, দান) নিয়মিত করা। দুনিয়ার স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (রহ.) বলেন—

“তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর হলো, বান্দা তার প্রতিটি কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করে এবং কোনো অবস্থায় আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না হয়।”

এটি সেই তাকওয়া, যা নবী-রাসূল ও সত্যিকারের ওলিয়ায়ে কেরামদের বৈশিষ্ট্য।

বাস্তব জীবনে তাকওয়ার স্তরের উদাহরণ:

১. প্রথম স্তরের মানুষ: সে গুনাহ করে না, তবে হালালকে সীমাহীনভাবে ভোগ করে।
 ২. দ্বিতীয় স্তরের মানুষ: সে সবসময় সন্দেহজনক বিষয় এড়িয়ে চলে।
 ৩. তৃতীয় স্তরের মানুষ: বৈধ হলেও এমন জিনিস বর্জন করে, যা তাকে গাফেল বানাতে পারে।
 ৪. চতুর্থ স্তরের মানুষ: অন্তরের অহংকার ও হিংসা দূর করে দেয়।
 ৫. পঞ্চম স্তরের মানুষ: প্রতিটি কাজে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টির খোঁজে থাকে।
- তাকওয়া মানুষের জীবনে ঈমানের সর্বোচ্চ শিখর। এটি শুধু ভয় নয়, বরং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য, আত্মসমর্পণ এবং আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধির সমন্বয়। তাকওয়ার স্তরগুলো ধাপে ধাপে অতিক্রম করলে মানুষ আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারে এবং আখিরাতে জান্নাতের সুসংবাদ পায়।

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)এর তাকওয়া

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ অনুসারী এবং খলিফায়ে রাশেদার প্রথম জন। তিনি ছিলেন দুনিয়ায় সাদাসিধা জীবনযাপনকারী, অথচ তাকওয়ার দিক দিয়ে অদ্বিতীয়। তাঁর জীবনে বহু ঘটনা আছে যা তাকওয়ার প্রকৃত অর্থকে তুলে ধরে।

হারাম থেকে বেঁচে থাকার তাকওয়া---একবার তাঁর দাস এক ধরনের খাবার এনে দিল। আবু বকর (রাঃ) সেটি কিছুটা খেয়ে নিলেন। পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন খাবারটির উৎস কী। দাস উত্তর দিল, এটি সে পূর্বে জাহেলী যুগে এক ব্যক্তির জন্য কুফরি ঝাড়ফুক করে আয় করেছিল।

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবু বকর (রাঃ) গভীর ভয়ে কেঁপে উঠলেন। তিনি বললেন: “আল্লাহর কসম! তুমি আমাকে এমন কিছু খাইয়ে দিলে যা হারামের সন্দেহে রয়েছে!” এরপর তিনি নিজের আঙুল গলায় ঢুকিয়ে খাবারটি বমি করে বের করে দিলেন, যদিও এতে কষ্ট হচ্ছিল।

এটি ছিল তাঁর তাকওয়া-র বাস্তব প্রকাশ। তিনি হারাম তো দূরের কথা, সন্দেহজনক বিষয়ও নিজের শরীরে প্রবেশ করতে দেননি। কারণ তিনি জানতেন, হারাম খাদ্য দেহে প্রবেশ করলে ইবাদতের আলো নষ্ট হয়ে যায়।

তাঁর দানের তাকওয়া---আবু বকর (রাঃ) সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করতেন। রাসূল ﷺ মদিনায় মসজিদ নির্মাণ শুরু করলে, তিনি নিজের সমস্ত সম্পদ প্রায় দান করে দেন। উমর (রাঃ) তখন বলেছিলেন: “আজ আমি আবু বকরকে অতিক্রম করব।” কিন্তু দেখা গেল, আবু বকর (রাঃ) নিজের পরিবারের প্রয়োজন বাদে সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছেন। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন: “হে আবু বকর! তুমি পরিবারের জন্য কী রেখেছ?” তিনি উত্তর দিলেন: “আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে রেখে এসেছি।”

এ উত্তরের মধ্যেই ফুটে ওঠে তাঁর তাকওয়া— আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা ও দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা।

কোরআনের আলোকে আবু বকর (রাঃ)---

আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝

“আর যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য মুক্তির পথ করে দেবেন।”

“এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দেবেন, যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তবে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কাজ সিদ্ধ করবেন। আল্লাহ সব কিছুর জন্য একটি নির্ধারিত পরিমাণ স্থির করেছেন”। (সূরা তালাক: ২-৩)

আবু বকর (রাঃ) এর জীবন এই আয়াতের জীবন্ত ব্যাখ্যা। তিনি সবকিছু আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেছিলেন, আর আল্লাহ তাঁকে মর্যাদা, সম্পদ ও নেতৃত্ব সবকিছু দান করেছিলেন।

শিক্ষা:

আবু বকর (রাঃ)-এর তাকওয়া আমাদের শেখায়—

১. খাদ্যে-পানীয়তে সতর্কতা: হারাম বা সন্দেহজনক কিছু গ্রহণ করা ঈমানকে দুর্বল করে।
২. দান ও উদারতা: তাকওয়া শুধু নিজের ভয়ে সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজের জন্য ত্যাগ করাও তাকওয়া।

৩. আল্লাহর প্রতি আস্থা: দুনিয়ার বস্তুতে ভরসা না করে আল্লাহর উপর নির্ভর করাই প্রকৃত তাকওয়া।

তাই আমরা যদি আবু বকর (রাঃ)-এর জীবন অনুসরণ করি, তবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস, অর্থনীতি ও দানশীলতায় তাকওয়া আসবে।

উমর(রা.) এর তাকওয়া

খলিফা থাকা অবস্থায় উমর (রাঃ) প্রায়ই রাতে শহরের গলি-ঘুপচি ঘুরে বেড়াতেন। উদ্দেশ্য ছিল— জনগণের খবর নেওয়া।

এক রাতে তিনি এক বৃদ্ধা মহিলার ঘরের সামনে গেলেন। ভেতরে মহিলা তার কন্যাকে বলছে:

“দুধের সঙ্গে পানি মিশিয়ে দাও।”

মেয়ে বলল: “আমিরুল মু’মিনীন (উমর) নিষেধ করেছেন।”

মা বলল: “উমর কি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন?”

মেয়ে উত্তর দিল: “না, কিন্তু উমরের রব (আল্লাহ) তো দেখছেন।”

এই ঘটনা শুনে উমর (রাঃ)-এর চোখে অশ্রু এল। পরদিন তিনি তাঁর ছেলে আসিমকে বললেন, সেই মেয়েকে বিয়ে করতে। সেই মেয়েই পরবর্তীতে উমর (রাঃ)-এর বংশে খ্যাতিমান খলিফা উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ)-এর পূর্বপুরুষ হন।

এ ঘটনা দেখায়, তাকওয়া শুধু উমর (রাঃ)-এর মধ্যে ছিল না; তিনি চাইতেন সমাজেও তাকওয়া ছড়িয়ে পড়ুক।

উমর (রাঃ)-এর বিনয় ও তাকওয়া:খলিফা হয়েও তিনি সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। একবার তিনি দামেস্কে যাচ্ছিলেন। তাঁর উটের পালা এলো—একটু তিনি নিজে চড়লেন, একটু তাঁর দাসকে চড়ালেন। শহরে প্রবেশের সময় দেখা গেল দাস উটে চড়েছে আর খলিফা পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন।

লোকেরা বলল: “হে আমিরুল মু’মিনীন! আপনি দাসের মতো হেঁটে যাচ্ছেন!”

তিনি উত্তর দিলেন: “ইসলাম আমাদেরকে মর্যাদা দিয়েছে। আমি দাস হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে সেটিই উত্তম যদি এতে তাকওয়া থাকে।”

এখান থেকে বোঝা যায়, তাকওয়া মানুষকে বিনয়ী করে।

কোরআনের আলোকে উমর (রাঃ):আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দেন যে, তোমরা আমানতসমূহ তাদের যথাযথ হকদারদের কাছে পৌঁছে দেবে। আর যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন

ন্যায়বিচারসহকারে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কতই না উত্তম উপদেশ দেন! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।” (সূরা নিসা: ৫৮)

উমর (রাঃ) তাঁর খিলাফতে এই আয়াত বাস্তবায়ন করেছিলেন। তিনি জানতেন—একজন শাসকের জন্য ন্যায়পরায়ণতা হলো তাকওয়ারয়ার সর্বোচ্চ প্রকাশ

শিক্ষা

হযরত উমর (রাঃ)-এর তাকওয়া আমাদের শেখায়:

১. আল্লাহভীতি: কখনো আত্মতুষ্টি নয়; বরং সবসময় জবাবদিহিতার ভয়।
 ২. ন্যায়বিচার: তাকওয়া মানে কেবল ইবাদত নয়, মানুষের হক আদায় করাও তাকওয়া।
 ৩. পরিবারে ন্যায়: নিজের আত্মীয়কেও ছাড় না দেওয়া।
 ৪. বিনয়: তাকওয়া মানুষকে অহংকার থেকে মুক্ত করে, তাকে সাধারণের মতো করে রাখে।
- উমর (রাঃ)-এর তাকওয়া ছিল এত গভীর যে, তাঁর শাসনামলে মাটিতে কুকুরও ক্ষুধায় মরত না। তাঁর নাম শুনলে শয়তান পথ পাঁটে দিত। এটি প্রমাণ করে, তাকওয়া মানুষকে এমন শক্তি দেয় যা দুনিয়ার কোনো শক্তি দিতে পারে না।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-এর তাকওয়া

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা। তিনি ধনী ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল গভীর তাকওয়া ও আল্লাহভীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন:

“উসমান হলেন সর্বাধিক লজ্জাশীল ব্যক্তি, এমনকি ফেরেশতারাও তাঁর থেকে লজ্জা করে।”

(সহীহ মুসলিম)

এ লজ্জাশীলতা ও অন্তরের পবিত্রতাই ছিল তাঁর তাকওয়ার প্রতিচ্ছবি। তিনি জীবনভর তাকওয়ার আলোয় আলোকিত ছিলেন।

লজ্জাশীলতায় তাকওয়া:উসমান (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। এমনকি নবী ﷺ নিজেও তাঁর সামনে বিশেষ সতর্ক থাকতেন। একবার নবী ﷺ ঘরে বসে ছিলেন, তাঁর কাপড় কিছুটা উন্মুক্ত ছিল। আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) আসলেন, তিনি তেমন কোনো পরিবর্তন করলেন না। কিন্তু উসমান (রাঃ) আসতেই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বসার ভঙ্গি ঠিক করলেন ও কাপড় সযত্নে গুছিয়ে নিলেন।

সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন, কেন তিনি উসমান (রাঃ)-এর সামনে এমন করলেন? তখন নবী ﷺ বললেন:

“আমি কি এমন ব্যক্তির সামনে লজ্জা না করব, যার সামনে ফেরেশতারাও লজ্জা করে?”

এখান থেকে বোঝা যায়, তাকওয়া শুধু আল্লাহভীতি নয়; বরং অন্তরের এমন পবিত্রতা যা অন্যকে লজ্জাশীল করে তোলে।

দানে তাকওয়া:উসমান (রাঃ)-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর উদার দানশীলতা। তিনি সবসময় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিতেন।

১. রুমাহ কূপ ক্রয়: মদিনায় যখন পানির কষ্ট ছিল, তখন একটি ইহুদির মালিকানাধীন কূপ ছিল। সে কূপ থেকে পানি কিনে মুসলমানদের পান করতে হতো। উসমান (রাঃ) তা বিপুল অর্থ দিয়ে কিনে নিলেন এবং মুসলমানদের জন্য ফ্রি করে দিলেন।

২. তাবুক অভিযানে দান: তাবুক অভিযানে মুসলমানদের প্রচণ্ড অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল। রাসূল ﷺ তখন সবাইকে দান করার আহ্বান জানান। উসমান (রাঃ) ৯৫০ উট, ৫০ ঘোড়া এবং বিপুল স্বর্ণ-রূপা দান করলেন।

রাসূল ﷺ তখন বললেন:

“আজ থেকে উসমান যা-ই করুক, তা তাঁকে ক্ষতি করবে না।” (তিরমিজি)

তাঁর তাকওয়া তাঁকে কৃপণতা থেকে মুক্ত করেছিল এবং আল্লাহর পথে অকৃপণ হতে শিখিয়েছিল।

ইবাদতে তাকওয়া: উসমান (রাঃ) কুরআন তেলাওয়াতে অগ্রগণ্য ছিলেন। বলা হয়, তিনি প্রায়শই একটি রাতে পুরো কুরআন শেষ করে ফেলতেন। তিনি বলতেন:

“যদি অন্তর পবিত্র থাকে, তবে মানুষ কখনো আল্লাহর বাণী থেকে তৃপ্ত হবে না।”

তাকওয়া তাঁর হৃদয়কে এতটাই কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল যে, তিনি কুরআনের আলোতেই জীবন যাপন করতেন।

শাহাদাতে তাকওয়া: উসমান (রাঃ)-এর জীবনের শেষ সময়টিও তাকওয়ার আলোয় উজ্জ্বল। যখন বিদ্রোহীরা তাঁর ঘর ঘিরে ফেলেছিল এবং খিলাফতের দাবিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল, তখন সাহাবীরা তাঁকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বললেন:

“আমি রক্তপাত চাই না। আমি চাই না আমার কারণে মুসলমানদের রক্ত ঝরুক।”

অবশেষে তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতে করতে শাহাদাতবরণ করেন। তাঁর রক্ত কুরআনের পৃষ্ঠায় ঝরে পড়ে।

তাকওয়ার কারণে তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিলেন, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত ঘটতে দিলেন না।

কোরআনের আলোকে উসমান (রাঃ)

আল্লাহ বলেন:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

“তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।” (সূরা

মুজাম্মিল: ২০)

উসমান (রাঃ)-এর দানশীলতা এই আয়াতের বাস্তব উদাহরণ। তিনি নিজের অর্থ-সম্পদকে আল্লাহর রাস্তায় ‘উত্তম ঋণ’ হিসেবে দান করেছিলেন।

শিক্ষা

হযরত উসমান (রাঃ)-এর তাকওয়া আমাদের শেখায়—

১. লজ্জাশীলতা তাকওয়ার অংশ।
২. দানশীলতা তাকওয়ার প্রকাশ।
৩. ইবাদত ও কুরআনের প্রতি ভালোবাসা তাকওয়ার নিদর্শন।
৪. শান্তি ও ধৈর্যের সাথে মৃত্যুবরণও তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর।

তাই আমাদেরও উচিত উসমান (রাঃ)-এর মতো অন্তরে লজ্জাশীলতা আনা, দানশীল হওয়া এবং কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলা।

হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর তাকওয়া

তাকওয়াহযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চাচাতো ভাই, জামাতা এবং ইসলামের চতুর্থ খলিফা। ছোটবেলা থেকেই তিনি নবী ﷺ-এর ঘরে লালিত-পালিত হন। তাই তাঁর চরিত্র, আচার-আচরণ, ইবাদত ও তাকওয়া নবী ﷺ-এর সরাসরি শিক্ষায় গড়ে ওঠে।

আলী (রাঃ) শুধু সাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না; তিনি ছিলেন অন্তরের পরিপূর্ণ তাকওয়াদার, ন্যায়পরায়ণ শাসক ও আল্লাহভীরু এক অমূল্য রত্ন।

সাহস ও তাকওয়া: হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের একজন। কিন্তু তাঁর বীরত্ব কখনো অহংকার বা প্রতিশোধে নয়, বরং তাকওয়ার ভিত্তিতে ছিল।

একবার এক যুদ্ধে তিনি একজন শত্রুকে পরাস্ত করে বুকে বসে পড়েন। তখন শত্রু আলী (রাঃ)-এর মুখে থুথু নিক্ষেপ করে। মুহূর্তের মধ্যে আলী (রাঃ) তাঁকে ছেড়ে দেন।

লোকেরা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

“আপনি কেন তাঁকে ছেড়ে দিলেন?”

আলী (রাঃ) বললেন:

“আমি আল্লাহর জন্য তাঁকে হত্যা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যখন সে আমার মুখে থুথু নিক্ষেপ করল, তখন যদি আমি তাকে হত্যা করতাম, তবে তা ব্যক্তিগত রাগ থেকে হতো, আল্লাহর জন্য নয়। তাই আমি ছেড়ে দিয়েছি।”

এটাই আসল তাকওয়া—নিজের রাগ, অহংকার বা প্রতিশোধকে নিয়ন্ত্রণ করে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা।

দুনিয়াবিমুখতায় তাকওয়া: আলী (রাঃ) ছিলেন দুনিয়ার প্রতি অত্যন্ত অনাসক্ত। যদিও তিনি খলিফা ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ মানুষের চেয়েও সহজ।

তিনি অনেক সময় মোটা কাপড় পরতেন। দিনে অল্প খাবার খেতেন, অনেক সময় শুধু শুকনো রুটি ও লবণ। খলিফা হওয়ার পরও তিনি কখনো বিলাসিতা গ্রহণ করেননি। তিনি বলতেন:

“দুনিয়া হলো মৃতদেহ, আর এর প্রেমিকরা হলো শেয়াল।”

তাঁর তাকওয়া তাঁকে দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে রেখেছিল।

ন্যায়ের প্রতি তাকওয়া: খলিফা হিসেবে আলী (রাঃ) ন্যায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর ছিলেন। তিনি কখনো আপনজনকে পক্ষপাতিত্ব করতেন না।

একবার তাঁর ঢাল হারিয়ে যায় এবং একজন ইহুদির হাতে পাওয়া যায়। আলী (রাঃ) বিচারকের কাছে মামলা দায়ের করেন। বিচারক প্রমাণ চাইলেন। আলী (রাঃ) নিজের ছেলে হাসান (রাঃ)-কে সাক্ষী হিসেবে দাঁড় করালেন। কিন্তু বিচারক বললেন, নিকটাত্মীয় সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। প্রমাণের অভাবে বিচারক ইহুদির পক্ষেই রায় দেন।

আলী (রাঃ) রায় মেনে নিলেন। ইহুদি তখন বিস্মিত হয়ে বলল:

“এমন ন্যায় আমি আগে কখনো দেখিনি। আল্লাহর কসম, এ ঢাল আপনারই।”

সে ঢাল ফিরিয়ে দিল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

এখানেই আলীর তাকওয়া—নিজের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ন্যায়কে প্রাধান্য দেওয়া।

ইবাদতে তাকওয়া: আলী (রাঃ) ছিলেন গভীর ইবাদতপ্রিয়। রাতে দীর্ঘ সময় নামাজ পড়তেন ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি নামাজ ভুলতেন না।

একবার তাঁর শরীরে তীর ঢুকে যায়। ডাক্তার তা বের করতে চাইলে প্রচণ্ড ব্যথা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আলী (রাঃ) বললেন:

“আমাকে নামাজে দাঁড়াতে দিন। আমি আল্লাহর সাথে লীন থাকাকালে তীরটি বের করে নিন।”

ডাক্তার তাই করলেন, আর আলী (রাঃ) ব্যথা অনুভবই করলেন না। তাঁর তাকওয়া ছিল আল্লাহর ইবাদতে এমন ডুবে থাকা, যেখানে দুনিয়ার কষ্ট অনুভূত হতো না।

শাহাদাতের মুহূর্তে তাকওয়া: হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত্যু ঘটেছিল শহীদের মতো। এক খারিজি তাঁকে ফজরের নামাজে আঘাত করে। তখন তিনি বললেন:

“ফজরের নামাজ মিস করো না। আল্লাহর জিকিরে অবহেলা করো না। তাকওয়া অবলম্বন করো।”

তাঁর শেষ উপদেশই ছিল তাকওয়া।

কোরআনের আলোকে আলী (রাঃ):

আল্লাহ বলেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ দেন ন্যায়বিচার করতে, উপকার করতে এবং আত্মীয়-স্বজনকে (অধিকার) দিতে। আর তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ এবং সীমালঙ্ঘন থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো।” (সূরা নাহল: ৯০)

আলী (রাঃ)-এর জীবন এই আয়াতের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিল। তিনি ন্যায়বিচার, সংকর্ম ও তাকওয়ার আলোয় খলিফাতুল্লাহ হিসেবে জীবন যাপন করেছিলেন।

শিক্ষা

হযরত আলী (রাঃ)-এর তাকওয়া আমাদের শেখায়—

১. তাকওয়া মানে রাগ ও প্রতিশোধ নিয়ন্ত্রণ।
২. তাকওয়া মানে দুনিয়াবিমুখতা ও সরল জীবনযাপন।
৩. তাকওয়া মানে ন্যায়ের ক্ষেত্রে আপসহীন থাকা।
৪. তাকওয়া মানে ইবাদতে একাগ্র হওয়া।
৫. তাকওয়া মানে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আল্লাহকে ভয় করা।

তাই আমাদের উচিত আলী (রাঃ)-এর মতো তাকওয়া অর্জন করা—ন্যায়পরায়ণ, সাহসী, দুনিয়াবিমুখ ও ইবাদতে একনিষ্ঠ হয়ে।

হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ)-এর তাকওয়া:

হযরত আবু উবাইদাহ আমির ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ (রাঃ) ছিলেন ইসলামের মহান সাহাবি। তিনি "আশারা মুবারাশশারাহ" অর্থাৎ জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবির একজন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেছেন:

“প্রত্যেক উম্মতের একজন আমিন (বিশ্বাসযোগ্য) থাকে। আর আমার উম্মতের আমিন হচ্ছেন আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ।” (সহীহ বুখারি)

অর্থাৎ, তিনি ছিলেন সততা, আমানতদারিতা এবং তাকওয়ার জীবন্ত প্রতীক।

সত্যের প্রতি তাকওয়া: আবু উবাইদাহ (রাঃ) ইসলামের প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কষ্ট, নির্যাতন ও বিপদের মুখে কখনো সত্যকে লুকাননি।

বদর যুদ্ধের সময় এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হন। তাঁর বাবা ছিলেন কাফের বাহিনীর পক্ষে। যুদ্ধক্ষেত্রে বাবা তাঁর সামনে আসেন। কিন্তু আবু উবাইদাহ (রাঃ) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি আনুগত্যকে অগ্রাধিকার দেন। শেষে তিনি আল্লাহর পথে লড়াই করতে গিয়ে নিজের বাবাকেও হত্যা করতে বাধ্য হন।

এটি ছিল তাকওয়ার সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা—আল্লাহর সন্তুষ্টি বনাম রক্তের সম্পর্ক। আবু উবাইদাহ (রাঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টিকে বেছে নিলেন।

তাকওয়া মানে সত্য ও ঈমানকে সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেওয়া-নিজের বাবা-মা বা পরিবার থেকেও।

নেতৃত্বে তাকওয়া: আবু উবাইদাহ (রাঃ) ছিলেন একজন অনন্য সেনাপতি ও নেতা। যখন মুসলমানরা শাম জয় করেন, তখন তাঁর নেতৃত্ব ছিল অনন্য। কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব অহংকার বা ক্ষমতার লোভে ছিল না—ছিল তাকওয়ার ভিত্তিতে।

উমর (রাঃ) তাঁকে শাম অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি রাজপ্রাসাদ বা জাঁকজমকপূর্ণ জীবন গ্রহণ করেননি। সাধারণ মুসলমানদের মতো একটি ছোট ঘরে থাকতেন, সাধারণ খাবার খেতেন।

উমর (রাঃ) একবার সফরে গিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখলেন—একটি চাদর, একটি তলোয়ার আর একটি পানির পাত্র ছাড়া কিছু নেই। উমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন:

“এই দুনিয়া সকলকেই বদলে দিয়েছে, কিন্তু আবু উবাইদাহকে বদলাতে পারেনি।”

তাকওয়া মানে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সরল জীবন যাপন করা।

আমানতদারিতায় তাকওয়া: রাসূল ﷺ তাঁকে “আমিনুল উম্মাহ” বলে অভিহিত করেছিলেন। অর্থাৎ, পুরো উম্মাহর সবচেয়ে আমানতদার মানুষ।

যুদ্ধের লুটের মাল হোক, রাষ্ট্রীয় ধন-সম্পদ হোক, অথবা মুসলমানদের দায়িত্ব—সবক্ষেত্রে তিনি পূর্ণ সততার পরিচয় দিতেন।

কখনো নিজের জন্য কিছু গ্রহণ করতেন না। এমনকি তিনি মৃত্যুশয্যাতেও নিজের দায়িত্ব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন।

তাকওয়া মানে আমানতের খেয়ানত না করা এবং সর্বদা সততার সাথে দায়িত্ব পালন করা। ধৈর্যে তাকওয়া: আবু উবাইদাহ (রাঃ) ছিলেন ধৈর্যের প্রতীক। তিনি অনেক যুদ্ধে মুসলমানদের নেতা ছিলেন। সবসময় ধৈর্য ধরে আল্লাহর উপর ভরসা রাখতেন।

একবার উমর (রাঃ) তাঁকে জরুরি সাহায্যের জন্য ডেকে পাঠান, কারণ তিনি মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আস্থাভাজন ছিলেন। কিন্তু তখন আবু উবাইদাহ (রাঃ) শামে প্লেগ মহামারিতে আক্রান্ত হন। তিনি আল্লাহর ফয়সালা মেনে নিয়ে বললেন:

“আমি চাই না আল্লাহর ফয়সালা থেকে পালাই। আমরা আল্লাহর হুকুমেই বাঁচি, আল্লাহর হুকুমেই মরব।”

অবশেষে তিনি প্লেগে শহীদ হন।

তাকওয়া মানে বিপদ-আপদে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।

কোরআনের আলোকে আবু উবাইদাহ (রাঃ):

আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।” (সূরা তাওবা:

১১৯)

আবু উবাইদাহ (রাঃ) ছিলেন সত্যবাদীদের অন্যতম সেরা উদাহরণ। তাঁর তাকওয়া তাঁকে সত্যবাদী, আমানতদার ও বিশ্বস্ত বানিয়েছিল।

শিক্ষা

হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ)-এর তাকওয়া আমাদের শেখায়—

১. তাকওয়া মানে সত্যের জন্য আপনজনকেও ত্যাগ করা।
২. তাকওয়া মানে ক্ষমতা পেয়েও সরল জীবন যাপন করা।
৩. তাকওয়া মানে আমানতের খেয়ানত না করা।
৪. তাকওয়া মানে বিপদ-আপদে ধৈর্য ধরা ও আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা।

তাই আমাদেরও উচিত আবু উবাইদাহ (রাঃ)-এর মতো তাকওয়া অবলম্বন করা—সত্যবাদী, আমানতদার, ধৈর্যশীল ও আল্লাহভীরু হয়ে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর তাকওয়া:

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ছিলেন ইসলামের বিশিষ্ট সাহাবি এবং দশজন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত সাহাবির একজন। তিনি অর্থ, ধন-সম্পদ ও ব্যবসায়িক ক্ষমতায় সমৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবনের মূল শক্তি ছিল আল্লাহভীতি ও তাকওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ আবদুর রহমান (রাঃ)-এর জন্য বলেছেন:

“অর্থ উপার্জনে তোমরা তাঁকে দেখো, কিন্তু দানশীলতায় তাঁকে অনুকরণ করো।” (তিরমিজি)

অর্থাৎ, তাঁর জীবনের সাফল্য কেবল ব্যবসায়িক দক্ষতায় নয়, বরং তাকওয়া ও আল্লাহভীতিতে নিহিত।

ধন-সম্পদে তাকওয়া: আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ছিলেন সবচেয়ে ধনী সাহাবিদের একজন। কিন্তু তিনি কখনো দুনিয়ার ধন-সম্পদে আসক্ত ছিলেন না।

একবার এক বিশাল ধন-সম্পদ সামনে আসল—সুন্দর, ঝকঝকে ও সমৃদ্ধ। তিনি সেটি গ্রহণ করতে গিয়ে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। লোকেরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল:

“আপনি কেন কাঁদলেন?”

তিনি বললেন:

“মুসআব ইবনে উমাইর (রাঃ) শহীদ হয়েছেন। তাঁর কাফনের কাপড়ও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। আর আমি আজ এত সম্পদী হয়ে আছি। আমি ভয় পাচ্ছি, আল্লাহ হয়তো দুনিয়াতেই আমাকে প্রতিদান দিচ্ছেন, আখিরাতে কিছুই পাব না।”

এটি তাঁর গভীর তাকওয়ার পরিচয়। তিনি বুঝতেন, প্রকৃত সুখ ও পুরস্কার আসে আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে, না যে দুনিয়ার ভোগ-সুখ থেকে।

দানে তাকওয়া: আবদুর রহমান (রাঃ) দানশীলতায় অতুলনীয় ছিলেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র, দরিদ্র ও গরীবদের জন্য প্রচুর অর্থ দান করতেন। রমজানের সময় দান করা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। ব্যবসায় লাভের অংশও আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিতেন। রাসূল ﷺ বলেছিলেন:

“আবদুর রহমান ইবনে আউফ একমাত্র ধনী ব্যক্তি, যার দান সর্বদা কবুল হয়।”

তাঁর তাকওয়া তাঁকে দানশীল ও উদার করে তুলেছিল।

জীবনধারায় তাকওয়া: আবদুর রহমান (রাঃ) ছিলেন সাদাসিধা জীবনযাপনকারী। তিনি নিজের ঘরে শুধু প্রয়োজনীয় জিনিস রাখতেন। বিলাসিতা ও আরাম তিনি তুচ্ছ মনে করতেন। তার ঘরে দান ও সাহায্যই ছিল প্রধান কাজ। তিনি বলতেন:

“যদি আল্লাহ আমাকে ধন দান করেছেন, তবে তা কেবল ত্যাগের জন্য। যদি তা দুনিয়ায় থেকে যায়, তবে তা আমার জন্য ক্ষতি।”

তাকওয়া তাঁকে দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে রেখেছিল।

কোরআনের আলোতে তাকওয়া:

আল্লাহ বলেন:

فَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بُلُغُ أَمْرٍ ۖ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ ٣١

“যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য (মুক্তির) পথ বের করে দেন। আর তিনি তাকে এমন স্থান থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করে না। আর যে আল্লাহর উপর ভরসা করে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর কাজ পূর্ণ করবেন। তিনি সব কিছুর জন্য একটি পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন (সূরা তালাক: ২-৩)

আবদুর রহমান (রাঃ)-এর জীবন এই আয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়ন। তাঁর ধন-সম্পদ, জীবনযাপন ও দানশীলতা সবই আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার আলোয় পরিচালিত ছিল।

শিক্ষা:

হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর তাকওয়া আমাদের শেখায়—

১. তাকওয়া মানে ধনী হলেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অগ্রাধিকার দেওয়া।
২. ধন-সম্পদে আসক্তি নয়, বরং আল্লাহর পথে ব্যয় ও দান।
৩. দুনিয়ার সুখ ও আরাম নয়, তাকওয়া মানুষের প্রকৃত শক্তি।
৪. আল্লাহভীতি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে—ইবাদত, দানশীলতা ও জীবনধারা।

আমাদের উচিত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর মতো ধনী হলেও তাকওয়ার আলোয় জীবন পরিচালনা করা।

সাহাবাদের ব্যবসায় তাকওয়া

সাহাবায়ে কেবল ইবাদতে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও তাকওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁরা জানতেন, ধন উপার্জন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু উপার্জনের পদ্ধতি ও সংকর্মে তাকওয়া বজায় রাখা আরও গুরুত্বপূর্ণ।

সং ব্যবসায়িক জীবন: সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) ও হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) ছিলেন ব্যবসায়িক দক্ষতায় অনন্য। কিন্তু তাঁরা কখনো কোনো অনৈতিক উপায়ে লাভ করতেন না।

একবার হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন:

“আমি এমন ব্যবসায়ী দেখেছি, যার ব্যবসা হালাল হলেও তিনি আল্লাহভীতি এবং সততার কারণে সবসময় সতর্ক থাকেন। যদি কোনো পণ্যে ত্রুটি থাকে, ক্রেতাকে তিনি তা জানিয়েই বিক্রি করেন।”

এটাই ব্যবসায়িক তাকওয়ার মূল শিক্ষা—লাভের জন্যও কখনো আল্লাহর বিধি লঙ্ঘন করা যাবে না।

ব্যবসায়িক উদাহরণ: এক সাহাবি এক বাজারে জিনিস বিক্রি করছিল। হঠাৎ বুঝলেন যে পণ্যটির একটি অংশ খারাপ। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতাকে জানানেন। ক্রেতা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল:

“আপনি কি ভেবেছেন, এতে আপনার ক্ষতি হবে?”

তিনি উত্তর দিলেন:

“আমার ক্ষতি হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি হারাতে চাই না।”

এখানেই ব্যবসায়িক তাকওয়ার মর্ম। তারা বুঝতেন—যে ক্ষতি আল্লাহর পথে স্বীকার করা হয়, তা আখিরাতে সর্বাধিক প্রতিদান দেয়। ধন উপার্জন করলেও তারা কখনো প্রতারণা বা জালিয়াতি করতেন না।

দানের মাধ্যমে তাকওয়া বৃদ্ধি: সাহাবীরা ব্যবসায় লাভ থেকে নিয়মিত দান করতেন।

হযরত উসমান (রাঃ) যুদ্ধ ও দারিদ্র্য মোকাবেলায় বিশাল দান করতেন।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) দুনিয়ার ধন উপার্জন করলেও আখিরাতে তৃপ্তি জন্য তা বিলিয়ে দিতেন।

ব্যবসায়িক তাকওয়া মানে—লাভের জন্য দুনিয়ার কৌশল নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ন্যায়ের পথ অনুসরণ।

শিক্ষা

সাহাবীদের ব্যবসায়িক তাকওয়া আমাদের শেখায়—

১. সততা ব্যবসার মূল ভিত্তি।

২. লাভের জন্যও কখনো হারাম পথ অবলম্বন করা যাবে না।

৩. আল্লাহভীতি ব্যবসার প্রতিটি সিদ্ধান্তে থাকা উচিত।

৪. লাভ থেকে আখিরাতের তৃপ্তি জন্য দান ও সাহায্য অবলম্বন করা।

ফলে, সাহাবীদের ব্যবসায়িক জীবন আজও আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। ধন-সম্পদ অর্জন ও ব্যবস্থাপনায় তাকওয়া বজায় রাখাই প্রকৃত মুসলিম ব্যবসায়ীর লক্ষ্য।

তাকওয়া বনাম গাফেলত

মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য নির্ভর করে তার ঈমান, আমল ও চরিত্রের উপর। ইসলামে তাকওয়া হলো সেই মহৎ গুণ, যা মানুষকে আল্লাহর ভয় ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রত্যেক ভালো কাজে উৎসাহী করে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে। অপরদিকে, গাফেলত হলো এমন এক মানসিক অবস্থা, যেখানে মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আল্লাহকে ভুলে যায়, আখিরাতকে উপেক্ষা করে এবং জীবনকে উদ্দেশ্যহীনভাবে কাটায়।

তাকওয়া মানুষের অন্তরকে জাগ্রত করে, আর গাফেলত অন্তরকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বোঝা প্রতিটি মুমিনের জন্য অপরিহার্য।

কোরআনে বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করার অধিকার তাঁর প্রতি রয়েছে, এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে যেন মৃত্যুবরণ না কর।” (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

তাকওয়া মুমিনকে ধৈর্যশীল করে, ন্যায়পরায়ণ করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে।

গাফেলতের সংজ্ঞা ও পরিণতি: গাফেলত মানে হলো অবহেলা, অসচেতনতা, উদাসীনতা। ইসলামের ভাষায়, গাফেলত হলো আল্লাহকে ভুলে যাওয়া, নামাজ-রোজা ও ইবাদতে উদাসীনতা, এবং আখিরাতের কথা ভুলে গিয়ে শুধু দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন হওয়া

কোরআনে বলা হয়েছে:

وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“আর আপনি সতর্ক করুন তাদেরকে, যারা ভয় করে যে তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে সমবেত হবে; তাঁর বাইরে তাদের জন্য নেই কোনো অভিভাবক ও কোনো সুপারিশকারী— হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে” (সূরা আনআম: ৫১)

গাফেলত মানুষকে ধীরে ধীরে গুনাহের দিকে টেনে নেয় এবং হৃদয়কে কঠিন করে ফেলে।
তাকওয়া বনাম গাফেলত: মূল পার্থক্য:

১. আল্লাহর স্মরণ বনাম আল্লাহর বিস্মরণ

তাকওয়ার অধিকারী সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণ করে।

গাফেল মানুষ আল্লাহকে ভুলে যায়।

২. আখিরাতের চিন্তা বনাম দুনিয়ার মোহ

তাকওয়াদার ব্যক্তি আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়।

গাফেল মানুষ শুধু দুনিয়ার আনন্দে মত্ত থাকে।

৩. সতর্কতা বনাম উদাসীনতা

তাকওয়া মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচায়।

গাফেলত মানুষকে গুনাহের পথে ঠেলে দেয়।

৪. আন্তরিক শান্তি বনাম অন্তর অশান্তি

তাকওয়ার ফলে অন্তরে শান্তি আসে।

গাফেল মানুষের অন্তর দুশ্চিন্তা ও শূন্যতায় ভরে যায়।

শিক্ষণীয় দিক: তাকওয়া ও গাফেলতের পার্থক্য থেকে আমরা বুঝতে পারি, আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার একমাত্র উপায় হলো তাকওয়া অবলম্বন করা। গাফেলত মানুষকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়, আর তাকওয়া মানুষকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে। তাই আমাদের উচিত প্রতিদিন নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করা—আমি কি তাকওয়ার পথে আছি নাকি গাফেলতের ঘোরে হারিয়ে যাচ্ছি?

তাকওয়ার উপকারীতা

তাকওয়া অর্থ হলো আল্লাহর প্রতি ভীতি, শান্তি ও আনন্দের প্রতি সচেতনতা এবং তাঁর নির্দেশাবলী অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। কোরআন ও হাদিসে তাকওয়া সর্বদা আলোকিত করা হয়েছে, এবং এটি মুসলিম জীবনের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। তাকওয়া কেবলমাত্র ভয়ের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অর্জনের পথ।

১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন: তাকওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত রাখে। যখন একজন মানুষ আল্লাহর বিধান মেনে চলে এবং পাপ থেকে বিরত থাকে, তখন তার হৃদয় ও জীবন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে এগিয়ে চলে।

২. পাপ ও দুষ্টিচার থেকে রক্ষা: তাকওয়া একটি প্রাকৃতিক আত্মসংযম। একজন তাকওয়ান ব্যক্তি সহজে পাপ, অবাধ্যতা বা অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর ভয় ও তার

অনুগ্রহের স্মরণ তাকে সঠিক পথ অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে। এই গুণটি মানুষকে নৈতিকভাবে সুসংগঠিত ও সামাজিকভাবে সম্মানিত করে।

৩. আত্মিক ও মানসিক শান্তি: তাকওয়া ব্যক্তিকে অন্তর্মুখী করে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা বৃদ্ধি করে। যখন মানুষ জানে যে আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, তার প্রতি সদয় এবং ন্যায়পরায়ণ, তখন সে নিজেকে নিরাপদ এবং শান্ত অনুভব করে। এটি মানসিক চাপ, হতাশা ও আতঙ্ক কমাতে সহায়ক।

৪. সামাজিক ও পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি: তাকওয়া কেবল ব্যক্তিগত জীবনে নয়, সামাজিক জীবনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তাকওয়ান মানুষ সত, ন্যায়পরায়ণ এবং সহানুভূতিশীল হয়। অন্যদের প্রতি সে দয়া ও ন্যায় প্রদর্শন করে। ফলে পরিবার, বন্ধু এবং সমাজে শান্তি ও সম্মান বৃদ্ধি পায়।

৫. জীবনের সাফল্য ও বরকত: কোরআনে বলা হয়েছে,

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَزِرُفُقًا ۖ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ
“আপনি আপনার পরিবারকে সালাত কায়েম করার নির্দেশ দিন এবং নিজেও এতে স্থির থাকুন। আমি আপনার নিকট রিজিক চাই না; আমিই আপনাকে রিজিক দিই। আর চূড়ান্ত সাফল্য তাকওয়ারই জন্য।” (সূরা তাহা, আয়াত ১৩২)

তাকওয়া মানুষকে ব্যবসা, শিক্ষা, পরিবার ও ব্যক্তিগত জীবনে সঠিক পথ প্রদর্শন করে। আল্লাহ তাদের জীবনকে সহজ ও সমৃদ্ধ করে দেন।

৬. পরকালের নিরাপত্তা: সবচেয়ে বড় উপকার হলো পরকালের নিরাপত্তা। তাকওয়া মানুষকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করে এবং আগুন থেকে রক্ষা করে। কোরআন ও হাদিসে তাকওয়াকে ঈমানের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রধান গুণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

তাকওয়া কেবল আল্লাহর ভয় নয়, বরং এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর ন্যায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী চলার ধারা। এটি মানুষের আত্মিক, মানসিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। একজন মুসলিমের জন্য তাকওয়া অর্জন করা মানে সুসংগঠিত, শান্তিপূর্ণ এবং সফল জীবন পাওয়া।

তাকওয়া অর্জনের উপায়

তাকওয়া ইসলামি জীবনের মূলভিত্তি এবং মানুষের নৈতিক উৎকর্ষের শীর্ষস্থান। এটি এমন এক গুণ, যা মানুষকে অন্যায়, পাপ ও কুফর থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করে। একজন মুমিনের জীবনে তাকওয়া অর্জন করা মানে হলো আল্লাহভীতিকে হৃদয়ে স্থাপন করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের চিন্তা, কথা ও কাজকে নিয়ন্ত্রণে

রাখা। তাকওয়া অর্জনের জন্য কিছু মৌলিক উপায় রয়েছে, যা অনুসরণ করলে একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে পরহেজগার হতে পারে।

প্রথমত, আল্লাহর গভীর জ্ঞান ও সচেতনতা অর্জন তাকওয়ার মূল ভিত্তি। মানুষ যখন বুঝতে পারে আল্লাহ সর্বদা তাকে দেখছেন, তাঁর প্রতিটি কাজ রেকর্ড হচ্ছে এবং পরকালে এর জবাব দিতে হবে—তখন সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। এই সচেতনতা বা “আল্লাহভীতি” হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে, পাপাচারের দিকে মন যায় না এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এজন্য নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন, চিন্তাভাবনা ও নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ বাড়ানো জরুরি।

দ্বিতীয়ত, নামাজের প্রতি যত্নশীল হওয়া তাকওয়া অর্জনের অন্যতম কার্যকর উপায়। নামাজ মানুষকে আল্লাহর সঙ্গে সংযুক্ত করে এবং তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখে। নিয়মিত সালাত আদায় করলে মনের ভেতর আল্লাহভীতি জাগ্রত হয়, যা তাকে অন্যায় ও গুনাহ থেকে দূরে রাখে। নামাজ শুধু একটি ধর্মীয় কর্তব্য নয়, এটি আত্মশুদ্ধিরও মাধ্যম।

তৃতীয়ত, হালাল-হারামের প্রতি সতর্ক থাকা তাকওয়ার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একজন মুত্তাকি ব্যক্তি কখনো হারাম উপার্জন গ্রহণ করে না এবং সন্দেহজনক জিনিস থেকেও দূরে থাকে। খাদ্য, পোশাক, আয়ের উৎস—সব ক্ষেত্রে সে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে। হালাল উপার্জন আত্মাকে শান্তি দেয়, আর হারাম আত্মাকে কলুষিত করে। তাই তাকওয়া অর্জনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈধ ও নিষিদ্ধের সীমা জানা এবং তা মেনে চলা অপরিহার্য।

চতুর্থত, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও ধৈর্যচর্চা তাকওয়ার অপরিহার্য শর্ত। তাকওয়াবান ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তি ও আবেগকে সংযত রাখতে জানে। রাগ, লোভ, হিংসা ও অহংকারের মতো দোষ থেকে দূরে থাকা তাকওয়ার পরিচায়ক। জীবনের প্রতিটি পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করা এবং অন্যায়ের জবাবে ন্যায় প্রদর্শন করা তাকওয়ার চিহ্ন।

পঞ্চমত, আখিরাতের চিন্তা ও জবাবদিহিতার অনুভব তাকওয়া অর্জনে গভীর প্রভাব ফেলে। একজন মুমিন যখন উপলব্ধি করে যে তাকে একদিন আল্লাহর সামনে নিজের প্রতিটি কাজের হিসাব দিতে হবে, তখন সে অন্যায়ের পথে হাঁটে না। এই জবাবদিহিতার অনুভূতিই মানুষকে সৎ পথে স্থির রাখে।

ষষ্ঠত, সৎ সঙ্গ গ্রহণ ও পাপাচারী পরিবেশ থেকে দূরে থাকা তাকওয়ার বিকাশে সহায়ক। সৎ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করলে ভালো কাজে আগ্রহ বাড়ে, আর অসৎ পরিবেশে থাকলে পাপের দিকে ঝোঁক জন্মায়। তাই আল্লাহভীর বন্ধু নির্বাচন করা ও সৎ সমাজ গঠন তাকওয়ার পথে অগ্রগতি আনে।

সবশেষে, নিয়মিত আত্মসমালোচনা ও তাওবা তাকওয়া অর্জনের শক্তিশালী উপায়। মানুষ ভুল করে, কিন্তু সে যদি নিজের ভুল বুঝে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় এবং পুনরায় সৎ পথে

ফিরে আসে, তবে তাকওয়া বৃদ্ধি পায়। প্রতিদিন নিজের কর্ম মূল্যায়ন করা, কৃত গুনাহের জন্য অনুশোচনা করা ও সংশোধনের চেষ্টা করা মুত্তাকিদের বৈশিষ্ট্য।

এটি একদিনে অর্জিত হয় না; বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সচেতনভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। তাকওয়া সম্পন্ন মানুষই প্রকৃত সফল, কারণ তাকওয়াই মানুষকে সত্যিকার অর্থে আল্লাহভীরু, ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক করে তোলে।

তাকওয়া অর্জন হলো একটি ধারাবাহিক সাধনা। এর জন্য প্রয়োজন—দৃঢ় ঈমান, নামাজ, রোজা, কুরআনের সঙ্গ, গুনাহ থেকে বাঁচা, নেক বন্ধু, যিকর ও দোয়া। এগুলো নিয়মিতভাবে চর্চা করলে আল্লাহ বান্দাকে তাকওয়ার উচ্চতায় উন্নীত করেন।

তাকওয়া ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ এবং আমলও পরিপূর্ণ হয় না। তাই আমাদের উচিত প্রতিদিন আত্মসমালোচনা করা, দোয়া করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

তাকওয়া—এ এমন এক আলো, যা মানুষের অন্তরকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে আসে। তাকওয়া হলো সেই অদৃশ্য ঢাল, যা পাপের আঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। এটি মুমিনের অন্তরে এমন ভয় জাগ্রত করে, যে ভয় আল্লাহর প্রতি ভালোবাসায় রূপ নেয়। তাকওয়াই মানুষকে সঠিক পথে রাখে, অন্যায় থেকে ফিরিয়ে আনে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে ধাবিত করে।

দুনিয়ার মোহ, শয়তানের প্ররোচনা এবং নফসের আহ্বান মানুষকে ভুলের পথে টেনে নিতে চায়। কিন্তু তাকওয়া সেই শক্তি, যা মানুষকে পাপের প্রলোভন থেকে ফিরিয়ে আনে এবং নেককার বান্দার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। তাকওয়াই সেই অমূল্য সম্পদ, যা কবরকে জান্নাতের বাগান বানায় এবং কিয়ামতের ময়দানে সহজ হিসাব ও মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে। হে মুমিন! মনে রেখো—ধন-সম্পদ, পদমর্যাদা কিংবা বংশ মর্যাদা নয়; প্রকৃত মর্যাদা তাকওয়াতেই নিহিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেছেন—

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ নিশ্চয় আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সর্বাধিক তাকওয়াবান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু জানেন ও সবকিছুর খবর রাখেন” (সূরা হুজুরাত: ১৩)

তাই আমাদের কর্তব্য হলো প্রতিদিন নিজেকে প্রশ্ন করা: আমি কি আজ তাকওয়ার পথে চলেছি, নাকি গাফেলতিতে ডুবে গেছি? প্রতিদিন আল্লাহর কাছে দোয়া করা: “হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরকে তাকওয়ায় ভরিয়ে দাও এবং আমাদেরকে তোমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করো।”

অতএব, তাকওয়াই হলো দুনিয়ার শান্তি, সমাজের ন্যায়, অন্তরের প্রশান্তি এবং আখিরাতের মুক্তির একমাত্র চাবি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত তাকওয়াবান বান্দা হওয়ার তাওফিক দিন—আমিন।

নেক আমল

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা মানুষের আত্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও আখিরাতমুখী উন্নতির পথ নির্দেশ করে। ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা মানুষের কল্যাণ ও শান্তির জন্য নির্ধারিত। এই শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো – নেক আমল বা সৎকর্ম।

“নেক আমল” বলতে বোঝায় – এমন সব কাজ যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী করা হয়। এই কাজগুলো হতে পারে ইবাদতের কাজ, সামাজিক কাজ, নৈতিক আচরণ, বা অন্তরের খালেস ইচ্ছা। যেমন: সালাত আদায় করা, গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করা, মা-বাবার প্রতি সদ্যবহার, মিথ্যা ও গীবত থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোরআনে বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَلَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"যে ব্যক্তি নেক আমল করে — সে পুরুষ হোক বা নারী, এবং সে মুমিন হয়, তাকে আমি নিশ্চয়ই একটি পবিত্র জীবন দান করব এবং তার নেক আমলের সর্বোত্তম প্রতিদান দিব।"

(সূরা নাহল: ৯৭)

এই আয়াতটি আমাদের শেখায়, যে নেক আমল কেবল আখিরাতে পুরস্কারের মাধ্যম নয়, দুনিয়ার জীবনেও শান্তি ও বরকতের উৎস।

নেক আমলের গুরুত্ব ও প্রভাব

নেক আমলের গুরুত্ব এতটাই বেশি যে কিয়ামতের দিন মানুষের পরিণতি নির্ধারণ হবে তার আমলের উপর ভিত্তি করে। একজন মুসলিমের প্রকৃত পরিচয় তার আচার-আচরণ ও নেক আমলের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়। ইসলামে শুধু বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়, বরং বিশ্বাসের সাথে সৎকর্ম আবশ্যিক।

আল্লাহ বলেন:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (সূরা বাকার: ৮২)

নেক আমলের প্রভাব শুধু ব্যক্তি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। একজন সৎ ব্যক্তি পরিবারে শান্তি আনে, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে এবং অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

নেক আমল আমাদের অন্তরকে শুদ্ধ করে, আল্লাহর নিকটবর্তী করে এবং আখিরাতে মুক্তির কারণ হয়। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত নিয়মিতভাবে নেক আমলে মনোযোগী হওয়া,

নিজের জীবনকে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করা এবং অন্যদেরও সেই পথে উৎসাহিত করা।

নেক আমল হচ্ছে ইসলামী জীবনের প্রাণ। এটি দুনিয়ার শান্তি, সমাজের কল্যাণ এবং আখিরাতের সফলতা অর্জনের একমাত্র পথ।

আল্লাহ তায়ালার জন্য খালেস নিয়তে নেক আমল

ইসলামে আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য প্রধান দুটি শর্ত হল:

১. নিয়ত খালেস হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।
২. আমলটি হতে হবে রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী।

আল্লাহ তায়ালার পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“তারা আদিষ্ট হয়েছিল কেবল এই কারণে যে, তারা যেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করে, তাঁরই জন্য দীনের কাজ করে, সরল পথ অবলম্বন করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। এটাই সঠিক ধর্ম।” (সূরা বাইয়্যিনা: ৫)

নিয়ত হলো অন্তরের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়। কোনো কাজের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নিয়তের উপর। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“নিশ্চয়ই সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সে-ই রয়েছে, যার জন্য সে নিয়ত করেছে।” (বুখারি ও মুসলিম)

নিয়ত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়, তবে সাধারণ কাজও ইবাদতে পরিণত হতে পারে। যেমন, পরিবারের জন্য উপার্জন, ঘুম, হাসিমুখে কারো সাথে কথা বলা — এসবও ইবাদতের মর্যাদা পেতে পারে, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়।

হাদীসে এসেছে:

“তুমি যা কিছু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করো, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে তোলা একটি খাদ্যও — তাতেও তুমি সওয়াব পাবে।” (বুখারি: ৫৬)

নেক আমল অনেক ধরনের হতে পারে, যেমন:

১. ইবাদত: সালাত, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি।
২. আচরণ: সদাচরণ, ক্ষমাশীলতা, বিনয়, ধৈর্য।
৩. সামাজিক কাজ: দান-সদকা, অসহায়দের সহায়তা, রাস্তা পরিষ্কার রাখা।
৪. জ্ঞান অর্জন ও শিক্ষা প্রদান।

এই সমস্ত আমল যদি খালেস নিয়তে করা হয় — শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য — তবেই তা কবুল হবে এবং আখিরাতে পুরস্কৃত হবে।

সুন্নাহভিত্তিক নেক আমল

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার মূল উৎস দুটি—আল-কুরআন এবং আল-হাদীস (সুন্নাহ)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবনের প্রতিটি দিকই উম্মতের জন্য আদর্শ এবং অনুসরণীয়। তিনি যা করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন, তাই সুন্নাহ হিসেবে গণ্য হয়। সুন্নাহ পালন করা শুধু একটি নেক কাজই নয়, বরং আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম। কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
বলুন, "তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

(সূরা আলে ইমরান: ৩১)

তাই একজন মুমিন মুসলিমের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুন্নাহভিত্তিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল:

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে আদায় করা: রাসূল (সা.) নামাজকে দ্বীনের মূল স্তম্ভ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুন্নাহ মোতাবেক নামাজ আদায় করলে তা শুধু ইবাদতই নয়, বরং শারীরিক ও আত্মিক প্রশান্তির উৎস হয়ে দাঁড়ায়।
২. তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া: তাহাজ্জুদ নামাজ রাসূল (সা.) নিয়মিত আদায় করতেন এবং সাহাবাদেরকেও উৎসাহিত করতেন। এটা আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উত্তম পথ।
৩. মিসওয়াক ব্যবহার করা: ওযু করার সময় মিসওয়াক ব্যবহার রাসূল (সা.)-এর নিয়মিত অভ্যাস ছিল। এটি শুধু মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখে না, বরং সুন্নাহ পালনের মাধ্যমে নেকিও অর্জিত হয়।
৪. সালাম দেওয়া ও ছড়িয়ে দেওয়া: রাসূল (সা.) বলেছেন, “তোমরা পরস্পরে সালাম প্রচার করো, তাহলেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।” সালাম একদিকে ভালোবাসা বাড়ায়, অন্যদিকে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ।
৫. ডান দিক দিয়ে কাজ শুরু করা: খাওয়া, পান করা, পোশাক পরা, ঘরে প্রবেশ ইত্যাদি সব ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) ডান দিক দিয়ে শুরু করতেন। এই সাধারণ কাজগুলোও যদি সুন্নাহ অনুযায়ী করা হয়, তা নেকির কারণ হয়ে যায়।
৬. ছোট-বড় সকল কাজের আগে বিসমিল্লাহ বলা: "বিসমিল্লাহ" বলা একটি ছোট কিন্তু প্রভাবশালী সুন্নাহ। এতে কাজের শুরুতেই আল্লাহর বরকত আসে এবং শয়তানের প্রভাব দূর হয়।

৭. জুমার দিনে গোসল, আতর ব্যবহার ও পরিষ্কার পোশাক পরিধান: জুমার দিনকে রাসূল (সা.) ‘সণ্ডাহের ঈদ’ বলেছেন। এই দিনটির বিশেষ মর্যাদা আছে, তাই সুন্নাহ মোতাবেক প্রস্তুতি নেওয়া অত্যন্ত নেক আমল।

৮. তাওবা ও ইস্তেগফার করা: রাসূল (সা.) নিজেই প্রতিদিন ৭০-১০০ বার ইস্তেগফার করতেন। আমাদের গুনাহ বেশি, তাই আমাদের আরও বেশি করে ক্ষমা চাওয়া উচিত।

৯. নবীজি (সা.)-এর উপর দরুদ পাঠ করা: রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” এটি একটি সহজ ও বরকতময় আমল।

১০. প্রতিদিন কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত করা: রাসূল (সা.) কুরআন তিলাওয়াতে গভীর মনোযোগ দিতেন এবং সাহাবীদেরকেও উৎসাহ দিতেন। এটি আত্মিক প্রশান্তি দেয় এবং আল্লাহর হেদায়েতের পথ খুলে দেয়।

সুন্নাহভিত্তিক নেক আমলগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সহজাত অংশ হতে পারে, যদি আমরা আন্তরিক হই এবং নিয়মিত চর্চা করি। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন অনুসরণ করাই প্রকৃত সফলতা। তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করলে আমরা ইহকাল ও পরকালে শান্তি লাভ করতে পারি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তাঁর রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গড়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

ইবাদতের মাধ্যমে নেক আমল

মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করা। এ লক্ষ্য পূরণে ইবাদত অন্যতম প্রধান মাধ্যম। ইবাদত শুধু নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রতিটি সং কাজই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। এইসব ইবাদতের মাধ্যমেই একজন মানুষ নেক আমল অর্জন করে পরকালীন মুক্তির পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে।

ইবাদতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব: ইবাদত হলো বান্দার সেই সমস্ত কাজ যা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে। কোরআনে বলা হয়েছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“আমি জিন ও মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।” (সূরা যারিয়াত:

৫৬)

ইবাদতের মাধ্যমেই মানুষের আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, নফসের খারাপ প্রবৃত্তিগুলো দমন হয় এবং সমাজে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা পায়।

ফরজ ইবাদত: ইসলামের আবশ্যিক করণীয়সমূহ: ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান, যেখানে ইবাদত তথা আল্লাহর বান্দা হিসেবে দায়িত্ব পালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইবাদতকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়: ফরজ (আবশ্যিক) ও নফল (ঐচ্ছিক)। এর মধ্যে ফরজ ইবাদত হলো সেই সকল কাজ, যা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নর-নারীর জন্য পালন করা বাধ্যতামূলক। ফরজ ইবাদত পালন না করলে মুসলমান গুনাহগার হয় এবং তার জন্য আখিরাতে শাস্তির ঘোষণা আছে।

ফরজ ইবাদতের ধরন: ইসলামে পাঁচটি প্রধান স্তরের মধ্যে কিছু ইবাদত ফরজ হিসেবে গণ্য হয়। নিচে তা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. সালাত (নামাজ): নামাজ হলো মুসলমানের জন্য দিনে পাঁচবার বাধ্যতামূলক ফরজ ইবাদত। এটি ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেন:

الصَّلَاةُ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

“নিশ্চয়ই নামাজ মু'মিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে।” (সূরা নিসা: ১০৩)

প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, বিবেকসম্পন্ন মুসলমানের জন্য নামাজ আদায় করা বাধ্যতামূলক। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়া মারাত্মক গুনাহ।

২. সাওম (রোজা): রমজান মাসে সাওম পালন করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য ফরজ। রোজা আত্মশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। আল্লাহ বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

“হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর।” (সূরা আল-বাকারা: ১৮৩)

৩. জাকাত: জাকাত হলো ধনী মুসলমানদের জন্য ফরজ অর্থনৈতিক ইবাদত। নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের উপর (সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা সমমূল্য) এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার নির্দিষ্ট অংশ (সাধারণত ২.৫%) গরীবদের মাঝে বিতরণ করতে হয়। এটি ধনসম্পদের পবিত্রতা বিধান করে।

৪. হজ: যাদের শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য আছে, তাদের জীবনে একবার হজ করা ফরজ। হজ ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ এবং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ۚ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“এতে রয়েছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থান। আর যে এতে প্রবেশ করে, সে নিরাপদ হয়। আর মানুষের উপর আল্লাহর হক হচ্ছে এ ঘরের হজ করা—যে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। আর কেউ যদি অস্বীকার করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সৃষ্টিজগতের মুখাপেক্ষী নন।” (সূরা আল-ইমরান: ৯৭)

অন্যান্য ফরজ ইবাদত:

উপরের বড় ফরজগুলো ছাড়াও আরও কিছু ফরজ ইবাদত রয়েছে, যেমন:

ইলম হাসিল করা: দ্বীনের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। হাদীসে বলা হয়েছে, “জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ।”

সততা ও আমানতের খেয়াল রাখা: ইসলামে সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা পালন করা ফরজ ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

পরিবার ও সন্তানদের হক আদায় করা: স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা, প্রতিবেশী ও সমাজের হক আদায় করাও ইসলামে ফরজ দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

ফরজ ইবাদত পালন না করলে পরিণতি

ফরজ ইবাদত ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা বড় গুনাহ এবং ইসলামী শরীয়তে তা মারাত্মক অপরাধ। কেউ যদি ফরজ নামাজ বা রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে না রাখে, তবে তাওবা না করলে তার উপর আখিরাতে শাস্তি অবধারিত। হাদীস ও কোরআনে এই বিষয়ে কঠোর সতর্কবার্তা রয়েছে।

ফরজ ইবাদত হলো ইসলামী জীবনের মূলভিত্তি। এগুলো পালনের মাধ্যমে একজন মুসলমান তার আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যথাযথভাবে ফরজ ইবাদতগুলো জ্ঞান অর্জন করা এবং তা নিয়মিতভাবে পালন করা। ইসলামী জীবনের পূর্ণতা আসে ফরজ ইবাদত দ্বারা, যা আমাদের আত্মিক ও সামাজিক জীবনে ভারসাম্য আনে।

নফল আমল সম্পর্কে

নফল আমল কী?

ইসলামে ‘নফল’ শব্দের অর্থ অতিরিক্ত বা ঐচ্ছিক। নফল আমল হলো এমন ইবাদত যা ফরজ বা ওয়াজিব নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অতিরিক্তভাবে করা হয়ে থাকে। এগুলোর জন্য সওয়াব রয়েছে, তবে না করলে গুনাহ হবে না। নফল আমল ব্যক্তির তাকওয়া, খালিছ নিয়ত ও ইখলাসকে বৃদ্ধি করে এবং ফরজ ইবাদতের ঘাটতি পূরণে সহায়ক হয়।

নফল ইবাদত :রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

“আমার বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।” — [সহীহ বুখারী: ৬৫০২]

অন্য এক হাদীসে এসেছে:

"কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের নামাজের হিসাব নেওয়া হবে। যদি তাতে কোনো ঘাটতি থাকে, তখন আল্লাহ বলবেন: 'দেখো, তার কোনো নফল নামাজ আছে কি না, যা দিয়ে ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করা যায়।'" — [আবু দাউদ: ৮৬৪]

এ থেকে বোঝা যায়, নফল আমল ফরজের ঘাটতি পূরণের সুযোগ সৃষ্টি করে।

প্রধান নফল আমলের উদাহরণ

১. নামাজ: তাহাজ্জুদ – রাতের শেষ অংশে পড়া হয়, আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে কষ্ট করে দাঁড়ানো।

দুহা (চাশতের) নামাজ – সকাল বেলা সূর্য একটু ওপরে উঠার পর পড়া হয়।

ইস্তিখারা – কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার জন্য।

আওয়াবিন – মাগরিবের পর ৬ রাকাত নামাজ।

তাহিয়াতুল মসজিদ – মসজিদে প্রবেশের পর দুই রাকাত নফল নামাজ।

২. রোজা: আশুরার রোজা (মুহররম ৯ ও ১০), আরাফার দিন রোজা (যারা হজ করছে না), সোম ও বৃহস্পতিবারের রোজা, শাবান মাসে অতিরিক্ত রোজা

৩. সদকা ও দান: ফরজ যাকাতের বাইরে স্বেচ্ছায় দান করা। গোপনে কাউকে সাহায্য করা। কষ্টে থাকা মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

৪. কোরআন তিলাওয়াত ও যিকির: কোরআন নিয়মিত তিলাওয়াত করা। সকালের ও সন্ধ্যার যিকির।

“সুবহানাল্লাহ”, “আলহামদুলিল্লাহ”, “আল্লাহু আকবার” ইত্যাদি বেশি বেশি বলা।

নফল আমলের উপকারিতা: আত্মার প্রশান্তি অর্জন হয়। আল্লাহর নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। দুনিয়াতে শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ তৈরি হয়। গুনাহ মার্ফের সুযোগ সৃষ্টি হয়। ঈমান মজবুত হয় ও আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা যায়।

ছোট ছোট নেক আমল

ইসলামে ছোট ছোট অনেক কাজ আছে, যেগুলো নিয়মিত করলে অনেক বড় সওয়াব পাওয়া যায়। এই আমলগুলো সহজ হলেও আল্লাহর কাছে তা অনেক মূল্যবান।

১. সালাম দেওয়া: রাসূল (সা.) বলেন:

"তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালাম প্রচার করো, তাহলে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

(মুসলিম)

পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেওয়া উত্তম।

২. হাসিমুখে কথা বলা: হাদীসে আছে:

"তোমার ভাইয়ের মুখে হাসিমুখে তাকানো – এটাও সদকা।" (তিরমিযি)

বিনয়ী ও আনন্দদায়ক আচরণ মানুষের হৃদয় জয় করে।

৩. ‘সুবহানাল্লাহ’, ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘আল্লাহু আকবার’ বলা: প্রতিটি বাক্য ১০টি করে সওয়াব বাড়িয়ে দেয়। দোয়া ও যিকির করা মুমিনের শান্তির উৎস।

৪. দোয়া করা :রাসুল (সা.) বলেন:

"দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মূল।" (তিরমিযি)

নিজের ও অন্যের জন্য দোয়া করা খুবই ফজিলতপূর্ণ।

৫. কষ্ট দূর করা : রাস্তা থেকে কাঁটা বা পাথর সরানো এক বড় সদকা। কারো উপকার করা – যত ছোট হোক, আল্লাহর কাছে তা অমূল্য।

৬. নামাজের পর দোয়া ও যিকির : প্রত্যেক ফরজ নামাজের পর ৩৩ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলা, এবং শেষে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহ, লাহুল মূলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাই’ইন কাদীর। বললে, অনেক সওয়াব লাভ হয়। (সহীহ মুসলিম)

৭. কোরআন তিলাওয়াত : প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০টি করে নেকি। প্রতিদিন অল্প হলেও কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

৮. উত্তম আচরণ ও দয়া : পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার। ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান। প্রতিবেশীর হক আদায়।

এই ছোট ছোট নেক আমলগুলো আমাদের প্রতিদিনের জীবনে সহজেই করা যায়। এগুলো ধারাবাহিকভাবে করলে আল্লাহর কাছে আমরা প্রিয় হয়ে উঠতে পারি। নেক আমল কখনো ছোট নয়—আল্লাহর দৃষ্টিতে তা অনেক বড় হতে পারে।

সামাজিক নেক আমল

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও জীবনঘনিষ্ঠ ধর্ম, যা মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামে যেমন নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাতের মতো ইবাদতের গুরুত্ব রয়েছে, তেমনি রয়েছে সমাজে মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার, সহানুভূতি, সহানুভূতি ও মানবসেবার ওপর জোর। মানুষের কল্যাণে কাজ করা, বিপদে-আপদে পাশে দাঁড়ানো, গরিব-দুঃখীর সাহায্য করা, মেহমানদারি করা, প্রতিবেশীর হক আদায় করা—এসবই ইসলামে “সামাজিক নেক আমল” নামে পরিচিত। এসব কাজ সমাজকে সুসংগঠিত করে, ভালোবাসা ও সহানুভূতির বন্ধন গড়ে তোলে, এবং ইসলামী মূল্যবোধকে শক্তিশালী করে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর গোটা জীবনেই সমাজের মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন এবং তাঁর উম্মতদেরকেও সেই পথেই চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাই

একজন প্রকৃত মুসলমানের জীবনে শুধু নামাজ-রোজা নয়, বরং সমাজে উপকারমূলক ও নেক কাজ করাও অত্যন্ত জরুরি।

সামাজিক নেক আমলের গুরুত্ব: সামাজিক নেক আমল মানুষকে সমাজে মর্যাদা এনে দেয় এবং আল্লাহর নিকট প্রিয় করে তোলে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

“মানুষের মধ্যে সে-ই উত্তম, যে মানুষকে উপকার করে।” (মুসলিম শরীফ)

এছাড়া তিনি আরও বলেছেন,

“তুমি যদি একটি কাঁটা সরিয়ে দাও রাস্তা থেকে, সেটিও সদকা।” (বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীসদ্বয় আমাদের বোঝায় যে, সমাজের জন্য সামান্য উপকারও আল্লাহর নিকট বড় নেক আমল হিসেবে গণ্য হয়।

সামাজিক নেক আমলের উদাহরণসমূহ:

১. প্রতিবেশীর হক আদায় করা: ইসলামে প্রতিবেশীর অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (সা.) বলেন,

“জিবরাইল (আঃ) আমাকে এতবার প্রতিবেশীর হক নিয়ে উপদেশ দিয়েছেন যে, আমি মনে করতাম তারা হয়ত উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে।” (বুখারী)

২. মেহমানদারি: মেহমানকে সম্মান করা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। রাসূল (সা.) বলেছেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস করে, সে যেন মেহমানের ইজ্জত করে।” (বুখারী)

৩. গরিব-দুঃখীদের সাহায্য করা: যে সমাজে ধনী গরিবের পাশে দাঁড়ায়, সে সমাজে শান্তি বিরাজ করে। ইসলাম গরিবদের সাহায্যকে একটি বড় নেক আমল বলে গণ্য করে।

৪. সদকা ও খয়রাত করা: সামাজিক দায়বদ্ধতার একটি অংশ হলো খয়রাত ও সদকা করা। এতে একদিকে দরিদ্র মানুষের উপকার হয়, অন্যদিকে দানকারী আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

৫. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা: নিজ পরিবার, সমাজ বা রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার করা ইসলামের অন্যতম শিক্ষা। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া একটি বড় নেক আমল।

৬. রাস্তা পরিষ্কার রাখা: রাস্তা থেকে কাঁটা, পাথর বা ক্ষতিকর কিছু সরানো, রাস্তা পরিষ্কার রাখা—এগুলোও মহান সামাজিক নেক আমল।

সামাজিক নেক আমলের ফলাফল: সমাজে ভালোবাসা ও সহানুভূতির পরিবেশ সৃষ্টি হয়। গরিব ও অসহায় মানুষদের জীবন সহজ হয়। অপরাধ কমে যায় এবং নিরাপদ সমাজ গড়ে ওঠে।

মানুষের মধ্যে সহমর্মিতা ও মানবতা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ হয়।

সামাজিক নেক আমল শুধুমাত্র মানুষের উপকারে আসে না, বরং এটি আল্লাহর নিকট কবুলযোগ্য একটি ইবাদতও বটে। একটি সমাজ তখনই উন্নত ও শান্তিপূর্ণ হতে পারে, যখন তার সদস্যরা একে অপরের জন্য কল্যাণকামী হয় এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী

সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। আমাদের উচিত, নিজের ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বগুলোও গুরুত্ব সহকারে পালন করা।

রাষ্ট্রীয় নেক আমল

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা কেবল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক জীবন নয়, বরং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। একজন মুসলমানের যেমন ব্যক্তিগত ইবাদত রয়েছে, তেমনি তার কিছু রাষ্ট্রীয় দায়িত্বও রয়েছে, যা পালন করাও একটি নেক আমল বা সওয়াবের কাজ। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত প্রত্যেকের জন্য কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন, জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপত্তা ও শিক্ষার সুযোগ তৈরি ইত্যাদি সবই রাষ্ট্রীয় নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত। এইসব কাজ কেবল দুনিয়াতে কল্যাণ আনে না, বরং আখিরাতেও সওয়াবের উচ্ছ্বাস হয়।

রাষ্ট্রীয় নেক আমলের ধারণা: “নেক আমল” বলতে বোঝায় এমন সকল কাজ, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যা সমাজ বা অন্যদের উপকারে আসে। রাষ্ট্রীয় নেক আমল হলো— এমন দায়িত্বশীল কর্মকাণ্ড, যা একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অথবা শাসক হিসেবে আদর্শভাবে পালন করা হয়। যেমন: জনগণের হক আদায় করা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, অসহায়দের সাহায্য করা, কর সঠিকভাবে প্রদান করা, জাতীয় সম্পদ সুরক্ষা করা ইত্যাদি।

ইসলামে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও নেক আমল:

১. ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা: আল্লাহ বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ করেন ন্যায়বিচার করতে।” (সূরা নাহল: ৯০)

একজন শাসকের প্রধান দায়িত্ব হলো, দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুবিচার দেওয়া। পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, ঘুষ, অন্যায়ের প্রশয় ইত্যাদি ইসলামে হারাম। সুতরাং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করাও একটি বড় রাষ্ট্রীয় নেক আমল।

২. গরিব ও অসহায়দের হক আদায় করা: রাষ্ট্র যদি গরিবদের জন্য খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, তাহলে তা একটি মহৎ ও নেক কাজ। রাসূল (সা.) বলেছেন: “তোমরা দুর্বলদের মাধ্যমে রিযিক ও সাহায্য লাভ করো।” (আবু দাউদ)

৩. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন: দুর্নীতি একটি সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। যারা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে থেকে দুর্নীতিমুক্ত থাকেন এবং অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখেন, তারা প্রকৃত অর্থেই নেক আমল করছেন।

৪. শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা: একটি নিরাপদ রাষ্ট্রই জনগণের উন্নয়নের জন্য সহায়ক। রাস্তা-ঘাট, হাট-বাজার, বাসা-বাড়ি, অফিস-আদালতে যদি নিরাপত্তা না থাকে, তাহলে মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র যদি শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তবে সেটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল।

৫. শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার: ইসলামে জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন:

"জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর ফরজ।" (ইবনে মাজাহ)

রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার এবং প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে, তাহলে সেটিও একপ্রকার সাদকা বা নেক আমল।

৬. সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা: ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সমানভাবে রক্ষা করা একটি বড় দায়িত্ব। ইসলাম এ ন্যায়নীতিক রাষ্ট্র গঠনের কথা বলে, যেখানে সবাই শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

৭. পরিবেশ রক্ষা ও জনসম্পদের সংরক্ষণ: প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা করাও একটি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এগুলো সংরক্ষণ করা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জরুরি। রাসূল (সা.) গাছ লাগানোর উৎসাহ দিয়েছেন এবং পরিবেশ নষ্ট না করতে বলেছেন।

নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় নেক আমল: শুধু শাসক নয়, সাধারণ নাগরিকেরও কিছু রাষ্ট্রীয় নেক আমল রয়েছে। যেমন: কর পরিশোধ করা, আইন মানা, রাস্তা পরিষ্কার রাখা, ট্রাফিক আইন মেনে চলা, জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা, ভোটাধিকার সঠিকভাবে প্রয়োগ করা, অন্যায় ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকা।

এই সব কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হলে তা নেক আমলে পরিণত হয়।

রাষ্ট্রীয় নেক আমলের উপকারিতা: সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা আসে। দারিদ্র্য ও দুর্নীতি কমে যায়। জনগণের অধিকার রক্ষা পায়। রাষ্ট্রের উন্নয়ন ও অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং জান্নাতের পথ সুগম হয়।

রাষ্ট্রীয় নেক আমল শুধু শাসকের দায়িত্ব নয়, বরং প্রতিটি মুসলমান নাগরিকের ওপরও কিছু দায়িত্ব বর্তায়। ইসলাম এমন এক রাষ্ট্র গঠনের দিকনির্দেশনা দিয়েছে, যেখানে মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত থাকবে, শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সবাই একে অপরের কল্যাণে এগিয়ে আসবে। তাই একজন সচেতন ও ঈমানদার নাগরিক হিসেবে আমাদের উচিত— রাষ্ট্রীয় দায়িত্বগুলো নেক আমল হিসেবে মনে করে যথাযথভাবে পালন করা, যাতে আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি এবং এই দুনিয়াতে একটি কল্যাণময় সমাজ গঠন করতে পারি।

অন্তরের নেক আমল

ইসলামে শুধু বাহ্যিক ইবাদত যেমন সালাত, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি নয়, বরং অন্তরের আমল বা হৃদয়ের কাজগুলোকেও অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেক সময় অন্তরের নেক আমল বাহ্যিক আমলের চেয়েও অধিক মূল্যবান হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, অন্তরের আমলই মানুষকে খাঁটি মু'মিন বানায়, আল্লাহর নিকট তার ইবাদত কবুল হওয়ার মূল শর্তও এটিই। অন্তরের আমল কী?

অন্তরের আমল হলো সেই সব নেক কাজ, যা বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাধ্যমে প্রকাশ না পেলেও মনের গভীরে ঘটে। যেমন:

১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্বে দৃঢ় বিশ্বাস)
২. ইখলাস (নিয়তের বিশুদ্ধতা – শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা)
৩. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর ওপর নির্ভরতা)
৪. সবর (ধৈর্য)
৫. শুকর (কৃতজ্ঞতা)
৬. খুশু' (নম্রতা ও বিনয় – বিশেষত সালাতে)
৭. খাওফ ও রাজা (আল্লাহর ভয় ও তাঁর রহমতের আশা)
৮. হাসাদ ও কিপটেমি থেকে মুক্ত থাকা
৯. রিয়া বা আত্মতুষ্টি – আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা

এই সবকিছুই অন্তরের কাজ, যা বাহ্যিকভাবে প্রকাশ না পেলেও আল্লাহ তাআলা এগুলো সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন এবং এগুলোর ভিত্তিতে মানুষকে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত করেন।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ অন্তরের আমল বিশ্লেষণ:

১. ইখলাস (নিয়তের বিশুদ্ধতা)--রাসূল (সা.) বলেন:

"নিয়তের উপরই সকল কাজ নির্ভর করে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস: ১)

একজন ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে ভালো কাজ করলেও যদি তার উদ্দেশ্য হয় মানুষের প্রশংসা অর্জন করা, তাহলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই প্রতিটি কাজের শুরুতেই নিয়ত ঠিক রাখা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্তরের আমল।

২. তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরতা)--আল্লাহ বলেন:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট।" (সূরা আত-তালাক: ৩)

সত্যিকার তাওয়াক্কুল মানে হলো নিজের চেষ্টার পাশাপাশি মনের গভীর থেকে বিশ্বাস করা যে ফলাফল আল্লাহর হাতে। এটি অন্তরের গভীর শক্তি ও আত্মবিশ্বাসের পরিচায়ক।

৩. খুশু' (সালাতে মনোযোগ ও নম্রতা)--আল্লাহ বলেন:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝

"নিশ্চয়ই মুমিনরা সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে খুশ্‌ ও মনোযোগী।" (সূরা আল-মুমিনুন:

১-২)

সালাতে খুশ্‌ এমন একটি অন্তরের অবস্থা, যা বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এটি অন্তরের প্রশান্তি এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন।

অন্তরের আমলের ফলাফল ও আমল বৃদ্ধি করার উপায়: অন্তরের নেক আমলের উপকারিতা: আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়, দুনিয়ার কষ্ট সহজ হয় (সবর ও তাওয়াক্কুলের কারণে), আত্মা পরিশুদ্ধ হয়, রিয়াকারি, অহংকার, হিংসা ইত্যাদি দূর হয়, আমল কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, জান্নাতের পথ সহজ হয়

কীভাবে অন্তরের আমল বৃদ্ধি করা যায়?

১. তাফাক্কুর ও মুরাকাবা: নিয়মিত চিন্তা করা – আমি কে? কেন আল্লাহ আমাকে সৃষ্টি করেছেন? আমি কোথায় যাচ্ছি?

২. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ নিয়ে ভাবা: কুরআন অন্তরকে জীবন্ত করে তোলে।

৩. নফল ইবাদত বৃদ্ধি: নফল সালাত, যিকির, দোয়া, তাওবাহ – এগুলো অন্তরকে আলোকিত করে।

৪. আল্লাহভীরু ও নেককারদের সান্নিধ্যে থাকা

৫. হিসাব নেওয়া (মুহাসাবা): প্রতিদিন নিজের অন্তর পর্যালোচনা করা – অহংকার, হিংসা, গীবত এসেছে কি?

আমাদের বাহ্যিক জীবনের মতই, আমাদের অন্তরের জগতের দিকেও খেয়াল রাখা জরুরি। অন্তরের নেক আমলই হলো ঈমানের প্রাণ। এই আমলগুলো ছাড়া বাহ্যিক আমল অনেক সময় মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তাই আসুন, আমরা আমাদের অন্তরের আমল পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ সুগম করি।

নেক আমলের প্রতিবন্ধকতা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। নেক আমল বা সংকর্ম হলো এমন কাজ, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয় এবং যার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের দুনিয়া ও আখিরাতে পুরস্কৃত করবেন। কিন্তু বাস্তব জীবনে আমরা দেখতে পাই, অনেক মুসলমান নেক আমল করতে আগ্রহী হলেও তা নিয়মিত করতে পারেন না বা মাঝপথে ছেড়ে দেন। এর পেছনে কিছু প্রতিবন্ধকতা কাজ করে, যেগুলো চিহ্নিত করে দূর করা খুবই জরুরি

১. শয়তানের ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা: শয়তান সবসময় মানুষের ঈমান ও নেক আমলের শত্রু। সে বিভিন্ন কৌশলে মানুষকে নেক আমল থেকে বিরত রাখে। যেমন: অলসতা ঢুকিয়ে দেয়: “আজ না, কাল করব”, “সময় নেই” — এ ধরনের ভাবনা ঢুকিয়ে দেয়।

আমলের গুরুত্ব কমিয়ে দেখায়: “এইটুকু আমল করলে কী হবে?”, “তুমি তো অনেক গুনাহগার” — এমন কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে হতাশ করে। আমলের মাঝে রিয়া বা লোক দেখানো ঢুকিয়ে দেয়। এতে আমল বরবাদ হয়ে যায়।

২. দুনিয়ার মোহ ও ব্যস্ততা: বর্তমানে মানুষ দুনিয়ার পেছনে ছুটতে ছুটতে নেক আমলের সময় পায় না, বা পেলে গুরুত্ব দেয় না। যেমন: অতিরিক্ত চাকরি বা ব্যবসার চিন্তা, বিনোদন ও সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি, ঘর-পরিবারে অতিরিক্ত ব্যস্ততা এতে সময় তো নষ্ট হয়ই, সাথে সাথে হৃদয়ও আল্লাহমুখী থাকে না। ফলে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে যায়।

৩. খারাপ পরিবেশ ও বন্ধু: একটি মানুষের আমল অনেকাংশে নির্ভর করে তার পরিবেশ ও সঙ্গীর উপর। যদি কারো বন্ধু হয়: নামাজে অনাগ্রহী, ইসলামি শিক্ষা বা চিন্তা থেকে দূরে, দুনিয়ার ফিতনায় নিমজ্জিত। তাই সেই ব্যক্তি ধীরে ধীরে নেক আমল থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। হাদীসে এসেছে:

“মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের উপর থাকে, সুতরাং তোমাদের প্রত্যেককে দেখা উচিত সে কাকে বন্ধু বানাচ্ছে।” (আবু দাউদ)

৪. জ্ঞান ও সচেতনতার অভাব: অনেকেই জানেন না যে কোন কাজটি নেক আমল এবং এর ফজিলত কতটা। আবার অনেকে ধর্মকে শুধু কিছু রীতিনীতিতে সীমাবদ্ধ মনে করেন। ফলে আমলের প্রতি ভালোবাসা জন্মায় না। ইচ্ছা থাকলেও প্রাত্যহিক জীবনে তা বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়।

উদাহরণস্বরূপ, কেউ হয়তো জানে না যে সুন্দরভাবে কথা বলাও একটি সদকাহ, ফলে তা করার আগ্রহও থাকে না।

৫. গুনাহে লিপ্ত থাকা: গুনাহ একদিকে যেমন ঈমান দুর্বল করে, তেমনি নেক আমল করতে বাঁধা দেয়। যারা: নিয়মিত মিউজিক, সিনেমা, অশ্লীলতায় লিপ্ত, হারাম রিজিকে জড়িয়ে আছে, চোখ, জবান ও অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ, তাদের পক্ষে নিয়মিত নেক আমল করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

কোরআনে এসেছে:

إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

“তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করো, তিনি তোমাদের জন্য পার্থক্য করার শক্তি দিবেন।” (সূরা

সমাধান কী?

নিয়মিত কোরআন ও হাদীস পড়া এবং বুঝা ভালো পরিবেশ তৈরি করা ও নেককার বন্ধু নির্বাচন। গুনাহ ত্যাগ করে তওবা করা। ছোট ছোট আমল দিয়ে শুরু করা। শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সচেতন থাকা।

নেক আমল জীবনের মূলধন। তবে বাস্তব জীবনে বিভিন্ন বাধা-বিপত্তির কারণে তা নিয়মিত রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এসব প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে, ধৈর্য ও চেষ্টা অব্যাহত রেখে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা উচিত। যে ব্যক্তি নিয়মিত নেক আমল করে, তার জীবন শান্তিময় ও পরকাল সফল হয় — ইনশাআল্লাহ।

দুনিয়াতে নেক আমলের প্রতিদান

ইসলামে নেক আমল অর্থাৎ সৎকর্ম বা ভাল কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নেক আমলের মাধ্যমে একজন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন এবং আখিরাতে মুক্তি লাভ করতে পারেন। তবে ইসলাম শুধুমাত্র আখিরাতে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়নি, বরং দুনিয়াতেও নেক আমলের ফল ভোগ করার সুসংবাদ দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসের বহু জায়গায় দেখা যায় যে, যারা আল্লাহর পথে চলে, তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, তারা দুনিয়াতেও শান্তি ও কল্যাণ লাভ করে।

নেক আমলের কিছু দুনিয়াবি ফলাফল:

১. রিজিকে বরকত ও প্রশস্ততা: আল্লাহ বলেন:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“যদি সে জনপদের লোকেরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের জন্য আকাশ ও জমিন থেকে বরকতসমূহ খুলে দিতাম।” (সূরা আল আরাফ: ৯৬)

নেক আমল করার ফলে দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলা রিজিকে বরকত দেন। একজন মুসলমান যদি আল্লাহভীতি ও সততার সাথে উপার্জন করে, তাহলে তার অল্প আয় থেকেও সে সুখী জীবনযাপন করতে পারে।

২. মন ও জীবনে শান্তি লাভ: নেক আমল যেমন সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, সৎ ব্যবহার ইত্যাদি মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনে। আল্লাহ বলেন:

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ

“নিশ্চয়ই আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।” (সূরা রাদ: ২৮)

আজকের পৃথিবীতে মানুষ যত আধুনিকতা অর্জন করছে, ততই মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগে ভুগছে। কিন্তু যারা আল্লাহর স্মরণে জীবন কাটায়, তারা মানসিক শান্তি ও স্থিরতা পায়।

৩. অপদস্থতা থেকে হেফাজত ও ইজ্জতের বৃদ্ধি: রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন,

“যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ তাকে মর্যাদায় উন্নীত করেন।” (সহীহ মুসলিম)

নেক আমল যেমন বিনয়, দান, সহানুভূতি, নম্রতা, ইত্যাদি মানুষকে সমাজে সম্মানিত করে তোলে। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অপমানের পরিবর্তে ইজ্জত দান করেন।

৪. বিপদাপদ থেকে রক্ষা ও সহজতা লাভ: “হাদীসে এসেছে, তিনজন লোক গুহায় আটকা পড়ে গিয়েছিল। তারা তাদের নেক আমলকে দোয়ার মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইল এবং আল্লাহ তাদের মুক্ত করলেন।” (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, সৎকর্ম বিপদে কাজ আসে। অনেক সময় মানুষ বিপদে পড়ে দোয়া করে এবং তার পূর্ববর্তী নেক কাজ আল্লাহর দরবারে সুপারিশরূপে কাজ করে।

৫. সন্তান ও পরিবারে বরকত: নেক আমলের প্রভাব শুধু আমলকারী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং তার পরিবার, সন্তান সবাই পায়।

নেক আমল (সৎকর্ম) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একমাত্র পথ। ইসলামের দৃষ্টিতে, প্রত্যেক নেক কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা প্রতিদান রাখেন — তা দুনিয়াতেই হোক কিংবা আখিরাতে। কোরআন ও হাদীসে বারবার উল্লেখ এসেছে, যারা সত্যিকারভাবে ইমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের দুনিয়ার জীবনে শান্তি, বরকত, সম্মান ও রিজিকের প্রশস্ততা দান করেন।

একজন মুসলিম যখন আল্লাহর ভয়ে নামাজ, রোজা, সদকা, উত্তম আচরণ, সত্যবাদিতা ইত্যাদি পালন করে, তখন সে কেবল আখিরাতের পুরস্কারই নয়, দুনিয়ার জীবনে অভ্যন্তরীণ শান্তি ও সমাজে মর্যাদা লাভ করে। আল্লাহ বলেন:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورة النحل، آية

“যে ব্যক্তি নেক আমল করবে — পুরুষ হোক বা নারী — এবং সে মু’মিন হবে, আমি তাকে অবশ্যই একটি সুন্দর জীবন দান করব...” (সূরা নাহল, ১৬:৯৭)

তাই উপসংহারে বলা যায়, নেক আমল শুধু আখিরাতের নাজাতের মাধ্যম নয়, বরং দুনিয়াতে কল্যাণ ও প্রশান্তির চাবিকাঠি। যারা আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে সৎকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, আল্লাহ তাদের এই দুনিয়াতেই উত্তম প্রতিদান দেন এবং পরকালের অফুরন্ত পুরস্কার তাদের জন্য সংরক্ষিত রাখেন।

আখিরাতে নেক আমলের প্রতিদান

আখিরাতে—অর্থাৎ পরকাল—হলো চিরস্থায়ী জীবন। মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে একমাত্র উদ্দেশ্যে: যেন সে আল্লাহর ইবাদত করে ও পরীক্ষা দেয়। এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখিরাতে

চিরস্থায়ী। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ভালো আমল করবে, আল্লাহর আদেশ পালন করে চলবে, আখিরাতে সে মহান প্রতিদান পাবে।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا

“যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের বাগান, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।” (সূরা কাহফ: ১০৭)

নেক আমল এক একটি বীজ, যা আখিরাতে ফল দিয়ে জান্নাতের বিশাল বাগান রূপে প্রকাশ পাবে।

আখিরাতে নেক আমলের কিছু উদাহরণ ও তাদের প্রতিদান:

১. নামাজ (সালাত): নামাজ ইসলামের প্রধান ইবাদত। রাসুল (সা.) বলেন:

“নামাজ হলো জান্নাতের চাবি।” (তিরমিজি)

কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে প্রথম প্রশ্ন হবে নামাজ নিয়ে। নামাজ ঠিক থাকলে বাকি আমল সহজ হবে।

২. রোজা: রোজা আত্মা পরিশুদ্ধ করে। রমজান ও নফল রোজা আল্লাহর প্রিয় ইবাদতের মধ্যে অন্যতম।

জান্নাতে রোজাদারদের জন্য “রাইয়ান” নামে একটি বিশেষ দরজা থাকবে।

৩. কুরআন তিলাওয়াত: প্রতিটি অক্ষরের জন্য ১০ নেকি। কুরআনের হাফেজ বা তিলাওয়াতকারী ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন সম্মানিত করা হবে।

৪. দান-সদকা: দান গোপনে করলে কিয়ামতের কঠিন দিনে আরশের ছায়া লাভ করা যাবে।

৫. উত্তম চরিত্র ও ভালো ব্যবহার:

রাসুল (সা.) বলেন:

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।”

উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তি কিয়ামতের দিন রাসুলের সান্নিধ্য লাভ করবে।

আখিরাতে নেক আমলের প্রতিদান: জান্নাতের কিছু প্রতিদান: আল্লাহ তাআলা কুরআনে বারবার জান্নাতের সুখ-সুবিধা উল্লেখ করেছেন। যারা নেক আমল করবে, তারা পাবে: দুঃখ-ব্যথাহীন জীবন, সুরম্য প্রাসাদ ও বাগান, ফলমূল, পানীয়, সঙ্গী, ফেরেশতাদের সালাম আল্লাহর সাক্ষাৎ ও সন্তুষ্টি

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ ۖ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْنُوءًا

“তাদের জন্য রয়েছে যা তারা চায়, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই পরহেয়গারদের জন্য পুরস্কার।” (সূরা ফুরকান: ১৬)

এই দুনিয়া খুবই সামান্য, কিন্তু আখিরাতে অনন্ত। আমাদের উচিত, এই অল্প সময়ের জীবনকে কাজে লাগিয়ে বেশি করে নেক আমল করা—যেমন নামাজ, রোজা, দান-সদকা, ভালো আচরণ ইত্যাদি। এই নেক আমলই আখিরাতে আমাদের পাথেয় হয়ে দাঁড়াবে।

একটি দোয়া:

“হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করো। আমাদের জান্নাত দান করো, এবং আমাদের নেক আমল করার তাওফিক দাও।”

আমিন।

নেক আমলই একমাত্র সম্পদ, যা আখিরাতে আমাদের উপকারে আসবে। তাই আসুন, দুনিয়াতে বেশি বেশি নেক আমল করি এবং আখিরাতে জান্নাতের অধিকারী হই।

নেক আমলের দাওয়াত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা এই দুনিয়াতে চিরস্থায়ী নই। আমাদের সামনে রয়েছে এক কঠিন ও দীর্ঘ সফর – কবর, হাশর, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এই দীর্ঘ সফরের পাথেয় একটাই – নেক আমল। তাই আজ আমরা নিজেরা সংকর্মের পথে আসার ও অন্যদের সেই পথে ডাক দেওয়ার সংকল্প করি।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

"যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নেক আমল করে, আমি তাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করব।" (সূরা কাহফ: ৩০)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, নেক আমল শুধু নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি ভালো কাজই নেক আমল — কারো মুখে হাসি ফোটানো, পথের কাঁটা সরানো, কারো কষ্টে পাশে দাঁড়ানো, মা-বাবার খেদমত, সততা, সময়ানুবর্তিতা, এমনকি স্ত্রীর মুখে এক চুমকি হাসি এনে দেওয়াও!

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেন:

"তোমরা আগুন থেকে বাঁচো, ثَمَرَةً — ولو بِشِقِّ ثَمَرَةٍ — যদিও তা একটি খেজুরের অর্ধেক দান করেই হোক।" (বুখারী ও মুসলিম)

দেখুন! একটি ছোট কাজ — মাত্র অর্ধেক খেজুর দান করাও কত বড় নেক আমল! আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনেক সুযোগ আসে নেক আমলের। কিন্তু আমরা তা চিনতে পারি না।
যেমন:

সকালে ঘুম থেকে উঠে বললাম: আলহামদুলিল্লাহ — এটা একটি নেক আমল।

অযু করে দুই রাকাত তাহিয়াতুল ওয়ু নামাজ পড়লাম — এটা নেক আমল।

রাস্তা থেকে একটা কাঁচের টুকরো সরালাম — এটাও নেক আমল।

কারো কষ্ট শুনে সহানুভূতি দেখালাম — এটাও নেক আমল।

এভাবে পুরো জীবনটাই নেক আমলে ভরিয়ে তোলা সম্ভব!

আরেকটি বিষয় মনে রাখুন, নেক আমল আমাদের গুনাহ মোচন করে।

রাসূল ﷺ বলেন:

"তোমরা গুনাহের পরপরই নেক আমল করো, তা গুনাহ মুছে দেবে।" (তিরমিজি)

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা,

এই পৃথিবী খুবই ক্ষণস্থায়ী। এখানে আমরা যা বপন করবো, পরকালে তারই ফসল কেটে খাবো। তাই এখনই সময় — আল্লাহর দিকে ফিরে আসার, তাওবা করার, এবং নেক আমলে নিজেকে সাজিয়ে তোলার।

কিছু সহজ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কায়েম করা

নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত

দিনে ১০০ বার সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদকা করা

সালাম দেওয়া এবং সম্পর্ক উন্নয়ন করা

গীবত, হিংসা ও অহংকার থেকে বেঁচে থাকা

আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে জীবনযাপন করা

পরিশেষে — আসুন, আজ থেকেই আমরা প্রতিজ্ঞা করি,

আমরা নিজেরা নেক আমলে মনোযোগী হবো,

এবং আমাদের পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশীকে এই নেক আমলের পথে ডেকে নেবো।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন, আমিন।

তাওবা ও আত্মশুদ্ধি

তাওবার শাস্তিক ও পারিভাষিক অর্থ:

“তাওবা” (توبة) শব্দটি আরবি “تَابَ - يَتُوبُ” ধাতু থেকে এসেছে, যার অর্থ “ফিরে আসা”।

অর্থাৎ, বান্দা যখন গুনাহ ও অবাধ্যতার পথ থেকে ফিরে এসে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে — সেটিই তাওবা।

ইসলামি পরিভাষায়,

“পাপ কাজ পরিত্যাগ করে, আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, অতীতের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে সেই পাপে আর না ফেরার দৃঢ় সংকল্প করাই তাওবা।”

তাওবা শুধু মুখের কথা নয় — এটি এক গভীর হৃদয়ের পরিবর্তন, একটি আত্মিক পুনর্জন্ম।

তাওবার মূল উদ্দেশ্য

তাওবা হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসা— নিজের ভুল, গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে বিরত হয়ে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আন্তরিকভাবে আত্মসমর্পণ করা।

তাওবার মূল উদ্দেশ্য হলো আত্মার পরিশুদ্ধি ও আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে ভুল করে, কিন্তু আল্লাহর বিশেষ দয়া হলো— তিনি বান্দাকে তাওবার মাধ্যমে সেই ভুল থেকে ফিরে আসার সুযোগ দেন।

১ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা: তাওবার প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ। মানুষ তাওবার মাধ্যমে জানায়—

“হে আল্লাহ, আমি আপনার অবাধ্য ছিলাম, এখন আমি শুধুই আপনার পথে ফিরে এসেছি।”
এভাবে তাওবা আল্লাহ ও বান্দার সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করে।

২ পাপমুক্ত জীবন গঠন করা: তাওবার মাধ্যমে মানুষ তার অতীত ভুলের দায় মুছে ফেলে এবং নতুনভাবে শুরু করার সুযোগ পায়।

“যে তাওবা করে, সে এমন যেন কখনও পাপ করেনি।” (ইবনে মাজাহ)

৩ অন্তরের প্রশান্তি ও আত্মশুদ্ধি: পাপের বোঝা মানুষকে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাওবা সেই বোঝা নামিয়ে দেয়, অন্তরকে হালকা ও শান্ত করে। এটি আত্মিক পরিশুদ্ধির সূচনা।

৪ সমাজে ন্যায্যের ও নেক আমলের পরিবেশ সৃষ্টি: যখন ব্যক্তি তাওবার মাধ্যমে সংশোধিত হয়, তখন তার পরিবার ও সমাজও উপকৃত হয়। তাওবা শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটি সামাজিক সংস্কারেরও একটি মাধ্যম।

৫ আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা লাভ: তাওবার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর দয়া ও মাফ অর্জন করা, কারণ তিনিই বলেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন।” (সূরা আজ-যুমার: ৫৩)

তাওবার মূল উদ্দেশ্য হলো— ভুল থেকে ফিরে এসে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা, এবং নতুনভাবে নেক আমলের পথে যাত্রা শুরু করা।

এটাই এক সত্যিকারের আত্মিক নবজন্ম — আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আহ্বান।

তাওবার প্রধান শর্তসমূহ

১. পাপ পরিত্যাগ করা (الإقلاع عن الذنب)

সত্যিকার তাওবা করার প্রথম শর্ত হলো — পাপের কাজটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া। কেউ যদি চুরি করে থাকে, তাকে চুরি বন্ধ করতে হবে। কেউ যদি মিথ্যা বলে, তাকে সত্য বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

অর্থাৎ তাওবা মানে শুধু দুঃখ প্রকাশ নয়; বরং পাপ থেকে সম্পূর্ণ বিরত হওয়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“আর তোমরা সবাই আল্লাহর নিকট তাওবা করো, হে মুমিনগণ, যাতে তোমরা সফল হও।”

(সূরা আন-নূর, আয়াত ৩১)

২. অতীতের জন্য অনুশোচনা করা (الندم على ما مضى)

তাওবার মূল হচ্ছে হৃদয়ের গভীর অনুতাপ। যে বান্দা নিজের গোনাহের জন্য সত্যিকারের আফসোস করে, তার তাওবা আল্লাহর নিকট মূল্যবান হয়।।

অনুশোচনা মানে শুধু মুখে দুঃখ প্রকাশ নয়, বরং মনে গভীর বেদনা অনুভব করা।

সে ভাবে, “আমি যদি এ পাপ না করতাম! আল্লাহর অবাধ্যতা করে আমি কত বড় ভুল করেছি।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“অনুশোচনাই তাওবা।” (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস: ৪২৫২)

৩. পুনরায় পাপে না ফেরার দৃঢ় সংকল্প (العزم على ألا يعود)

সত্যিকার তাওবা তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন বান্দা নিজের মনে দৃঢ় অঙ্গীকার করে যে, “আমি আর কখনো এই পাপে ফিরে যাব না।”

ভবিষ্যতে আবারও সেই একই ভুলে না পড়ার চেষ্টা করতে হবে। যদি পরে অনিচ্ছাকৃতভাবে আবার পাপে পড়ে যায়, তবে পুনরায় তাওবা করতে হবে। আলেমদের মতে:

“যে ব্যক্তি তাওবা করে অথচ আবার পাপ করার পরিকল্পনা রাখে, তার তাওবা মিথ্যা।”

৪. অন্যের হক হলে তা ফিরিয়ে দেওয়া (رد الحقوق إلى أهلها)

যদি তাওবা এমন কোনো গোনাহের জন্য হয় যেখানে অন্যের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয়েছে, তবে শুধু অনুশোচনা যথেষ্ট নয়। বরং সেই অধিকার পূরণ করা বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া বাধ্যতামূলক।

উদাহরণস্বরূপ:

চুরি করলে জিনিসটি ফেরত দিতে হবে। অন্যের সম্মানহানি করলে ক্ষমা চাইতে হবে। কারো অর্থ আত্মসাৎ করলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান বা সম্পদের ক্ষতি করেছে, সে যেন আজই তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেয়, কিয়ামতের আগে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস: ২৪৪৯)

৫. তাওবার সময়সীমা (وقت التوبة)

তাওবা জীবনের যেকোনো মুহূর্তে করা যায়, তবে কিছু সময় আছে যখন তা গ্রহণ করা হয় না। তাওবার গ্রহণযোগ্যতার দুটি সীমা আল্লাহ ও রাসূল ﷺ নির্ধারণ করেছেন —

(ক) মৃত্যু আসার আগে:

حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ فَلَا تَوْبَةَ لَهُمْ

“যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, ‘এখন আমি তাওবা করলাম’ — তখন তার তাওবা গ্রহণ করা হয় না।” (সূরা আন-নিসা: ১৮)

(খ) সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়ার আগে:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“সূর্য পশ্চিম দিক থেকে ওঠার আগে যে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা গ্রহণ করেন।”

— (সহীহ মুসলিম, হাদীস: ২৭০৩)

অতিরিক্ত কিছু আদব ও শর্ত

১. তাওবার পর নেক আমল বৃদ্ধি করা — যেমন নামাজ, দান, রোযা ইত্যাদি।

২. পাপের স্থান ও সঙ্গ ত্যাগ করা — যেন পুরোনো অভ্যাস ফিরে না আসে।

৩. তাওবা করার সময় আন্তরিকভাবে আল্লাহর কাছে দোয়া করা — “রব্বিগফিরলী, ওয়াতুব ‘আলাইয়া, ইন্নাকা আনতা তাওয়াবুর রাহীম।”

তাওবা শুধু একটি ইবাদত নয়, বরং এটি আল্লাহর এক অনন্য দয়া। যত বড় গোনাহই হোক, যদি বান্দা আন্তরিকভাবে ফিরে আসে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দেন।

কোরআনে তাওবার গুরুত্ব

তাওবা ইসলামের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাওবা অর্থ হলো—পাপ থেকে ফিরে আসা, অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং ভবিষ্যতে আর সেই পাপে লিপ্ত না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। মানুষ স্বভাবতই ভুল করে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাওবার মাধ্যমে সেই ভুল থেকে মুক্তি ও ক্ষমা লাভের সুযোগ দিয়েছেন। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাওবার গুরুত্ব, শর্ত এবং গ্রহণযোগ্যতার দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাওবা শুধু মুখের কথা নয়; এটি হৃদয়ের অনুতাপ, কাজের পরিবর্তন এবং নফসের পরিশুদ্ধির একটি বাস্তব প্রক্রিয়া।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সর্বদা তাওবার দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ, আল্লাহ চান না তাঁর বান্দারা পাপে নিমজ্জিত থাকুক; বরং তারা যেন পাপ ত্যাগ করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। তাওবার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তাঁর রহমতের ছায়ায় ফিরে আসে। কোরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তিনি তাঁর বান্দাদের তাওবা গ্রহণ করেন যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু এসে যায়। তাওবা এমন এক মহান উপায় যার মাধ্যমে একজন মানুষ পুনরায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং তার অতীত জীবনের পাপগুলো মুছে যায়।

তাওবা মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে নিয়ে যায়। এটি অন্তরের অহংকার, গাফেলতি ও পাপাচার থেকে মুক্তি দেয় এবং মনকে শান্তি ও প্রশান্তি দান করে। যারা আন্তরিকভাবে তাওবা করে, আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন এবং তাদের গুনাহ মাফ করে দেন। একজন তাওবাকারী আল্লাহর কাছে এমন একজনের মতো, যার কোন পাপই নেই। তাই কোরআন আমাদের আহ্বান জানায় যেন আমরা সর্বদা তাওবা করি, কারণ মানুষ কখন কোন গুনাহ করে ফেলে তা অনুধাবন করতে পারে না। তাওবা শুধু গুনাহ থেকে মুক্তি নয়, বরং এটি আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের একটি মহান উপায়। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত, জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে নিজের ভুল ও গাফেলতি উপলব্ধি করে আন্তরিক তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

তাওবা কেবল ব্যক্তিগত মুক্তির নয়, এটি সামাজিক পবিত্রতারও উৎস। যখন মানুষ আল্লাহভীত হয়ে নিজের ভুল থেকে ফিরে আসে, তখন অন্যায়, অন্যায়তা, জুলুম ও বিশৃঙ্খলা হ্রাস পায়। এভাবে তাওবা একটি সমাজকে নৈতিকভাবে পুনর্জাগরিত করে।

তাওবা হলো বিশ্বাস, ভয় ও ভালোবাসার এক অনন্য সমন্বয়। এটি মানুষকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে আসে, হৃদয়কে প্রশান্ত করে, এবং পাপের ভার থেকে মুক্তি দেয়।

অতএব, তাওবা শুধু একটি ধর্মীয় রীতি নয়, বরং এটি আল্লাহর কাছে ফিরে আসার চিরন্তন আহ্বান — আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ এবং জান্নাতের পথে সর্বশ্রেষ্ঠ সূচনা

রাসূল (সা.)-এর তাওবা

তাওবা মানে হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, নিজের ভুল বা গাফিলতির জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। এই তাওবা শুধু গুনাহগার মানুষের জন্য নয় — বরং আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা, আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ ﷺ-ও প্রতিদিন তাওবা করতেন।

নবী (সা.)-এর তাওবা করার অভ্যাস: রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, যার জীবনে কোনো পাপ ছিল না। তবুও তিনি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। সহীহ হাদীসে এসেছে —

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে তাওবা করো, আমি তো প্রতিদিন একশ বার তাওবা করি।” — (সহীহ মুসলিম)

আরেক হাদীসে নবী ﷺ বলেন —

“আমি দিনে সত্তরবার, কখনো একশ বার পর্যন্ত আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ও তাওবা করি।” — (সহীহ বুখারী)

এই হাদীসগুলো থেকে বোঝা যায়, নবী ﷺ নিজে ছিলেন নিষ্পাপ, তবুও তিনি আল্লাহর সামনে বিনয়, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে নিয়মিত তাওবা করতেন।

কেন নবী (সা.) তাওবা করতেন?

১. আল্লাহর প্রতি গভীর বিনয় প্রকাশ: তিনি সর্বদা আল্লাহর নিকট নিজেকে দাস হিসেবে দেখেছেন। তাওবা ছিল তাঁর দাসত্বের প্রকাশ।

২. উম্মতের জন্য শিক্ষা: তাঁর তাওবা ছিল আমাদের জন্য উদাহরণ। তিনি চেয়েছেন তাঁর অনুসারীরা যেন কখনো গুনাহ করে হতাশ না হয়।

৩. আল্লাহর নিকট আরও নিকটবর্তী হওয়া: তাওবা আল্লাহর স্মরণ ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে। নবী ﷺ আল্লাহর সান্নিধ্যে আরও গভীরভাবে থাকতে চাইতেন।

নবী (সা.)-এর দোয়া ও তাওবার রূপ: রাসূল ﷺ আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন নানাভাবে। তাঁর তাওবা শুধু মুখের শব্দ ছিল না, বরং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি।

একটি সুপরিচিত দোয়া হলো —

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ

“হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার ওপর অনেক জুলুম করেছি। তুমি ছাড়া কেউ পাপ ক্ষমা করতে পারে না। তুমি আমাকে তোমার পক্ষ থেকে ক্ষমা করো এবং আমার প্রতি দয়া করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”

তাওবা ও নবীর বিনয়:রাসূল ﷺ কখনো নিজের কোনো গুনাহের কথা বলেননি, বরং আল্লাহর প্রতি নিরন্তর কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা প্রকাশ করেছেন। তিনি মসজিদে দীর্ঘ সময় সেজদায় থাকতেন, কাঁদতেন, বলতেন —

“হে আল্লাহ! তুমি কি আমার প্রতি সন্তুষ্ট?”

এত বিনয় ও ভালোবাসা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মানুষ যত মহানই হোক না কেন, আল্লাহর সামনে বিনয়ী থাকা তাওবার প্রকৃত রূপ।

উম্মতের জন্য দোয়া ও তাওবা:নবী ﷺ কেবল নিজের জন্য নয়, তাঁর উম্মতের জন্যও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন।

কোরআনে আল্লাহ বলেন —

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“তিনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন, আর আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করেন।” (সূরা আত-

তাওবা, ৯:১০৩)

এটি প্রমাণ করে যে, নবী ﷺ সর্বদা তাঁর উম্মতের কল্যাণে ব্যাকুল ছিলেন এবং তাঁদের ক্ষমার জন্য তাওবা ও দোয়া করতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তাওবা ছিল পূর্ণ ঈমান, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার প্রতিফলন। তিনি তাওবার মাধ্যমে আমাদের শিখিয়েছেন — যতই নেক বান্দা হই না কেন, আমাদের আল্লাহর সামনে সবসময় বিনয়ী থাকতে হবে। গুনাহ হলে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করতে হবে, কারণ দেরি করলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায়। তাওবা শুধু মুখের নয়, কাজ ও হৃদয়ের পরিবর্তনেরও নাম।

অতএব, নবী ﷺ এর জীবনের অন্যতম শিক্ষা হলো — তাওবা হচ্ছে ঈমানের নবজাগরণ ও আল্লাহর নৈকট্যের সর্বোত্তম পথ।

সাহাবায়ে কেরামের তাওবা

তাওবা কেবল সাধারণ মানুষের কাজ নয় — এটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবায়ে কেরামের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা ছিলেন এমন এক প্রজন্ম, যারা পাপ করলে কখনো গাফিল থাকতেন না; বরং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে ফিরে আসতেন। কোরআন ও হাদীস তাদের তাওবার অনন্য উদাহরণে ভরপুর।

তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে উত্তম মর্যাদা:সাহাবারা জানতেন — মানুষ হিসেবে ভুল হতেই পারে, কিন্তু ভুলের পর তাওবাই মুক্তির একমাত্র পথ। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“যারা খারাপ কাজ করার পর তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৩৫)

এই আয়াতের অর্থ তারা জীবনে বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁদের তাওবা শুধু মুখের কথা ছিল না, বরং আচরণ ও জীবনধারায় পরিবর্তনের নিদর্শন ছিল।

হযরত উমর (রাঃ)-এর তাওবা:ইসলামের পূর্বে উমর (রাঃ) ছিলেন কঠোর মনের মানুষ। একদিন তিনি রাগের বশে নবী ﷺ-কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। কিন্তু কোরআনের কয়েকটি আয়াত শুনে তাঁর অন্তর পরিবর্তিত হয়। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন, সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করেন এবং ইসলামের পতাকাবাহী সাহাবায় পরিণত হন।

তাঁর এই তাওবা ছিল আন্তরিক, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রতিফলিত হয়। তিনি প্রতিদিন নিজেকে হিসাব দিতেন —

“আজ আমি আল্লাহর বিধান মানতে ব্যর্থ হয়েছি কিনা?”

এটি ছিল আত্মশুদ্ধির এক বিরল দৃষ্টান্ত।

হযরত কা'ব ইবন মালিক (রাঃ)-এর তাওবা:তাবুক অভিযানে অংশ না নেওয়ার কারণে নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন। ৫০ দিন পর কা'ব (রাঃ) গভীর অনুশোচনায় কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন।

এই ঘটনা প্রমাণ করে — সত্যিকারের অনুশোচনা ও ধৈর্যশীল তাওবা কখনো বৃথা যায় না। হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর তাওবা ও বিনয়:আবু বকর (রাঃ) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সাহাবি, তবুও তিনি নিজের সম্পর্কে বলতেন —

“আমি যদি আল্লাহর ক্ষমা না পাই, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব।”

তিনি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন এবং নিয়মিত দোয়া করতেন —

“হে আল্লাহ! আমার সব ভুল ক্ষমা করে দাও, যা আমি জানি এবং যা জানি না।”

তাঁর বিনয় ও তাওবা আমাদের শেখায় যে, আল্লাহর নিকট প্রিয় বান্দারাও সর্বদা ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকেন।

হযরত আলী (রাঃ)-এর আত্মসমালোচনা:আলী (রাঃ) প্রায়ই রাতের বেলায় কাঁদতেন এবং বলতেন —

“হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতি অবাধ্য হয়েছি, কিন্তু তোমার দরজায় ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয় নেই।”

তাঁর এই তাওবা ছিল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও বিনয়ের সর্বোচ্চ প্রকাশ।

সাহাবারা তাওবার মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন এনেছেন:

তাদের তাওবা কেবল ব্যক্তিগত ছিল না; বরং সমাজে নৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করেছিল। তারা একে অপরকে তাওবার দিকে আহ্বান করতেন, এবং আল্লাহভীতি ছিল তাদের সমাজের ভিত্তি।

তাদের তাওবা ছিল তিন রকম:

১. গুনাহের পর অনুতাপ ও পরিবর্তন।

২. ভুল বোঝাবুঝি বা অবহেলার পর আল্লাহর দিকে ফিরে আসা।

৩. আল্লাহর স্মরণে হৃদয় নরম হওয়া ও কৃতজ্ঞতার তাওবা।

সাহাবায়ে কেরামের তাওবা আমাদের শেখায় যে, মানুষ যত বড়ই গুনাহ করে ফেলুক না কেন, আল্লাহর দরজা কখনো বন্ধ হয় না।

তারা আমাদের দেখিয়েছেন — তাওবা মানে কেবল “ক্ষমা চাওয়া” নয়, বরং “নিজেকে বদলে ফেলা।”

তাদের জীবনের প্রতিটি তাওবা ছিল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, ভয়, বিনয় ও আত্মশুদ্ধির প্রতিচ্ছবি।

অতএব, সাহাবাদের মতো আমাদেরও উচিত — গুনাহ বুঝে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং নিজেদের জীবনকে আল্লাহভীতির আলোয় আলোকিত করা।

তাওবার উপকারিতা

তাওবা মানে হলো আল্লাহর দিকে ফিরে আসা, নিজের ভুল ও গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে তা থেকে বিরত থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার করা। এটি শুধু পাপ মোচনের পথ নয়, বরং আত্মশুদ্ধি, মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর নৈকট্যের মাধ্যম। কুরআন ও হাদীস তাওবার অসংখ্য উপকারিতা বর্ণনা করেছে।

১. তাওবা আল্লাহর ক্ষমা ও রহমত লাভের পথ:

কুরআনে আল্লাহ বলেন —

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীদের ভালোবাসেন এবং যারা নিজেদের পরিচ্ছন্ন রাখে তাদেরও ভালোবাসেন।” (সূরা আল-বাকারা, ২:২২২)

আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সবচেয়ে বড় উপায় হলো তাওবা। আল্লাহ তাওবাকারীদেরকে ক্ষমা করেন এবং তাদের উপর রহমতের দরজা খুলে দেন।

এই আয়াত প্রমাণ করে, তাওবা আল্লাহর রহমতের দ্বার খুলে দেয় এবং মানুষকে হতাশা থেকে মুক্ত করে।

২. তাওবা হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে: তাওবা হৃদয়ের মরচে দূর করে, আত্মাকে পবিত্র করে।

নবী ﷺ বলেছেন —

“যখন মানুষ গুনাহ করে, তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে। যদি সে তাওবা করে, দাগ মুছে যায়।” — (সহীহ মুসলিম)

তাওবা মানসিক ভার লাঘব করে, আত্মাকে হালকা ও শান্ত করে তোলে। যে মানুষ তাওবা করে, তার অন্তর আল্লাহর স্মরণে প্রশান্ত হয়।

৩. তাওবা রিজিক ও বরকত বৃদ্ধি করে:কোরআনে হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বলেছিলেন

فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

“তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো; নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করবেন।”

(সূরা নূহ, ৭১:১০-১২)

এই আয়াতে আল্লাহ স্পষ্ট করেছেন যে, তাওবা শুধু পাপ মোচন করে না, বরং জীবনে বরকত, রিজিক ও সুখের দরজা খুলে দেয়।

৪. তাওবা দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়:তাওবা করলে আল্লাহ বান্দার দুঃখ দূর করেন এবং জীবনে শান্তি দান করেন। আল্লাহ বলেন —

وَمَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ فَإِنَّهُ يَغْفِرْ لَهُ وَيُذْهِبْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ

“আর যে আল্লাহর প্রতি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন এবং তার দুঃখ দূর করেন।” (সূরা আত-তাগাবুন, ৬৪:১৭)

তাওবা এমন এক মানসিক প্রশান্তি দেয়, যা কোনো বস্তুগত সুখেও পাওয়া যায় না। তাওবা মানুষকে হতাশা, ভয় ও অনুশোচনা থেকে মুক্তি দেয়।

৫. তাওবা জান্নাতের পথ উন্মুক্ত করে:তাওবা হলো জান্নাতের অন্যতম চাবি। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সবসময় নিজেদের ভুলের জন্য তাওবা করেন এবং জান্নাতের আশায় তাঁর দিকে ফিরে আসেন।

৬. তাওবা মানুষকে অহংকার থেকে রক্ষা করে:যে মানুষ তাওবা করে, সে নিজের দুর্বলতা ও ভুল স্বীকার করে আল্লাহর সামনে বিনয় প্রকাশ করে। এই বিনয় তাকে অহংকার, আত্মপ্রবঞ্চনা ও আত্মঅহংকার থেকে মুক্ত রাখে।

নবী ﷺ বলেছেন —

“যে ব্যক্তি তাওবা করে, সে যেন কখনোই পাপ করেনি।” (ইবন মাজাহ)

অতএব, তাওবা মানুষকে নতুন জীবনের সুযোগ দেয় এবং আল্লাহর দয়ায় পুনর্জন্মের মতো পবিত্র অনুভূতি দেয়।

৭. তাওবা সমাজে নৈতিক পরিবর্তন আনে:যখন মানুষ গুনাহ থেকে ফিরে আসে, তখন সমাজ থেকে অন্যায়, দুর্নীতি, মিথ্যা ও জুলুম কমে যায়। তাওবা একটি সমাজে নৈতিক সচেতনতা ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে।

তাওবা হচ্ছে আত্মশুদ্ধির সূচনা, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের সেতুবন্ধন এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তির আশ্রয়। এটি শুধু অতীতের ভুল মুছে দেয় না, ভবিষ্যতের পথও আলোকিত করে। অতএব, তাওবা শুধু গুনাহ মার্ফের উপায় নয় — বরং এটি জীবনের নবজাগরণ, আল্লাহর নৈকট্যের চাবি, এবং সফলতার নিশ্চয়তা।

তাওবা না করার কুফল

তাওবা না করা একজন মুসলমানের জীবনে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় দিক থেকেই ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যারা গুনাহ করেও তাওবা করে না, তারা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের হৃদয় ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে যায়, ফলে ভালো কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাওবা না করার কারণে গুনাহের বোঝা দিন দিন বাড়তে থাকে এবং সেই গুনাহ আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হয়। এরা আত্মার শান্তি হারায়, মন সবসময় অস্থির ও অশান্ত থাকে। দুনিয়ার জীবনে তারা নানা বিপদ-আপদ, কষ্ট ও দুঃখে জর্জরিত হয়।

তাওবা না করা ব্যক্তির দোয়া কবুল হয় না, কারণ গুনাহ তার ও আল্লাহর মাঝে এক অদৃশ্য পর্দা সৃষ্টি করে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মধ্যে তাওবাকারীরা অন্যতম, তাই যারা তাওবা করে না তারা আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। তাওবা আত্মশুদ্ধির প্রথম ধাপ; এটি ছাড়া মানুষের অন্তর কখনো পরিশুদ্ধ হয় না এবং সে নেক আমলের স্বাদও পায় না। সবচেয়ে ভয়াবহ কুফল হলো— মৃত্যু আসার সময় মানুষ অনুতপ্ত হয়, তখন সে আফসোস করে বলে, ‘হায়! যদি আমি তাওবা করতাম।’ কিন্তু তখন আর ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকে না। তাই তাওবা বিলম্ব না করে যত দ্রুত সম্ভব আল্লাহর দিকে ফিরে আসাই মুমিনের জন্য নিরাপত্তা ও মুক্তির পথ।

আল্লাহর গজব ও শাস্তির আশঙ্কা

আল্লাহ তায়ালা বলেন —

وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালেম।” (সূরা আল-হুজুরাত, ১১)

অর্থাৎ, তাওবা না করা মানেই অন্যায় ও জুলুম করা। যখন মানুষ গুনাহ করে কিন্তু ক্ষমা চায় না, তখন সে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে।

তাওবা না করলে মানুষের হৃদয় ধীরে ধীরে কালো ও অন্ধকার হয়ে যায়। নবী ﷺ বলেছেন —

“যখন বান্দা গুনাহ করে, তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে; যদি সে তাওবা না করে, সেই দাগ বড় হতে থাকে, যতক্ষণ না পুরো হৃদয় ঢেকে ফেলে।” (সহীহ মুসলিম)

তাওবা না করা মানে হলো — হৃদয়ের আলো নিভিয়ে ফেলা। যখন হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, তখন ভালো-মন্দের বোধ নষ্ট হয়, মানুষ অন্যায়কে স্বাভাবিক মনে করতে শুরু করে।

আত্মশুদ্ধি (আত্মাকে পবিত্র করা)

আত্মশুদ্ধি অর্থ হলো — নিজের মন, নফস (প্রবৃত্তি), চিন্তা ও কর্মকে এমনভাবে পরিশুদ্ধ করা যাতে তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপযোগী হয়। এটি একজন মুসলমানের জীবনের মূল উদ্দেশ্যগুলোর একটি।

আত্মশুদ্ধির সংজ্ঞা:

“আত্মশুদ্ধি” (আরবিতে: তাযকিয়াতুন নাফস) বলতে বোঝায়—

নিজের ভেতরকার খারাপ গুণ, যেমন অহংকার, হিংসা, লোভ, ক্রোধ, লালসা, কপটতা, ইত্যাদি দূর করা এবং ভালো গুণ যেমন তাকওয়া, ধৈর্য, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি অর্জন করা।

কোরআনের আলোকে আত্মশুদ্ধি

আত্মশুদ্ধি বা নফসের শুদ্ধি কোরআনে অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মশুদ্ধি মানুষকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন, হৃদয়ের পবিত্রতা এবং নৈতিক উৎকর্ষের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি নিয়মিত তার নেক কাজ বৃদ্ধি করে, গুনাহ থেকে বিরত থাকে এবং সতর্কভাবে নিজের মনোভাব ও আচরণ পর্যালোচনা করে, আল্লাহ তাকে দুনিয়ার শান্তি এবং আখিরাতে মহান প্রতিদান দান করেন। আত্মশুদ্ধির ফলে মানুষের অন্তর শান্ত হয়, সমাজে ন্যায় ও সদাচার প্রতিষ্ঠা হয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। কোরআনে এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আত্মশুদ্ধি এমন একটি পথ, যা মুমিনের জীবনকে সমৃদ্ধ করে এবং তাকে চিরস্থায়ী মুক্তি ও জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে।

কোরআনুল কারীমে আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَذُفِّلِحْ مَنْ زَكَّاهَا
وَفَذُفِّلِحْ مَنْ دَسَّاهَا

“নিশ্চয়ই সফল সেই ব্যক্তি, যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে; আর ব্যর্থ সেই ব্যক্তি, যে তা কলুষিত করেছে।” (সূরা আশ-শামস: ৯-১০)

আরেকটি আয়াত:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۚ

“আমরা তাদেরকে আমাদের নিদর্শন প্রদর্শন করব আকাশ ও পৃথিবীতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে, যাতে তাদের কাছে নিশ্চিত হয়ে আসে যে এটাই সত্য।” (সূরা ফুসসিলাত: ৫৩)

এই আয়াতগুলো নির্দেশ করে যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করা মানুষের প্রকৃত সফলতার চাবিকাঠি।

আত্মশুদ্ধি শুধু বাহ্যিক ইবাদত নয়, বরং অন্তরের ইখলাস, ধৈর্য, বিনয় ও নৈতিকতা গড়ে তুলে।

কোরআন আমাদের শিখিয়েছে— আত্মশুদ্ধি ছাড়া প্রকৃত ঈমান পূর্ণ হয় না।

মানুষের সৌন্দর্য দেহে নয়, অন্তরে। অতএব আমাদের উচিত—পাপ থেকে বিরত থাকা, নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা। আল্লাহর স্মরণে জীবন কাটানো।

“আত্মশুদ্ধি হলো সেই আলো, যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়।”

রাসূল ﷺ এর জীবনে আত্মশুদ্ধির পরিচয়

রাসূল ﷺ এর জীবন আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি ﷺ সব সময় নিজের অন্তর পরিশুদ্ধি এবং নৈতিক উৎকর্ষের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। রাসূল ﷺ নিজের আচরণে সততা, ধৈর্য, নম্রতা ও দয়া প্রকাশ করতেন এবং সমস্ত কার্যকলাপে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতেন। গুনাহ ও অশুদ্ধিকর চিন্তাভাবনা থেকে নিজেকে দূরে রাখার মাধ্যমে তিনি ﷺ আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখতেন। সাহাবায়ে কেরাম দেখতেন কিভাবে তিনি ﷺ রাতে একাকী আল্লাহর নৈকট্য কামনা করে দোয়া ও ইবাদত করতেন, মানুষের সঙ্গে সদাচার ও ন্যায়পরায়ণ আচরণ করতেন এবং নিজের অন্তরের ক্ষুদ্রতম দুর্বলতাগুলোকেও শুদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন। তাঁর ﷺ এই জীবনদর্শন আমাদের শেখায় যে, আত্মশুদ্ধি শুধুমাত্র ইবাদত বা দোয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়; এটি দৈনন্দিন আচরণ, মনোভাব এবং চিন্তাধারার সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদের ব্যক্তিত্বকে পবিত্র ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে।

দোয়া ও ইখলাসের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি: রাসূল ﷺ সবসময় আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন যাতে তার অন্তর ও নফস পবিত্র থাকে।

“হে আল্লাহ! আমার অন্তর পরিশুদ্ধ করো এবং আমার নফসকে পবিত্র করো।” (সহিহ মুসলিম)

তিনি সাহাবীদেরও আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব বোঝাতেন এবং দোয়ার মাধ্যমে নফস পরিশোধের অনুশীলন করতেন।

রাতের ইবাদত (কিয়ামুল লায়ল): রাসূল ﷺ রাতে উঠে ইবাদত করতেন। এই রাতের ইবাদত অন্তরকে আল্লাহর দিকে স্থির রাখে। এটি নফসের খারাপ প্রবৃত্তি দমন করে।

“সচেতন হও, রাতের নামাজ ঘুমের চেয়ে উত্তম।” (সহিহ বুখারি)

সাহাবীদের শিক্ষাদান: রাসূল ﷺ শুধু নিজের জন্য নয়, সাহাবীদেরকেও আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দিতেন।

“আমি পাঠানো হয়েছি উচ্চমাত্রার নৈতিকতা সম্পূর্ণ করার জন্য।” (সহিহ বুখারি)

সাহাবারা রাসূল ﷺ থেকে শিখে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করতেন।

তাওবা ও ইস্তেগফার:রাসূল ﷺ সর্বদা তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করতেন।

وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا

“আপনার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন; তিনি সর্বদা ক্ষমাশীল।” (সূরা নিসা: ১০৬)

তাওবা শুধু পাপ মোচনের মাধ্যম নয়, বরং নফসের কলুষ দূর করার পথ।

নৈতিক চরিত্র ও আখলাক:রাসূল ﷺ সর্বদা সৎ চরিত্র ও আখলাকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতেন। বিনয়, সহানুভূতি, ধৈর্য, ক্ষমাশীলতা তার দৈনন্দিন আচরণে প্রতিফলিত হত। তিনি অন্যদের সঙ্গে সদাচরণ ও ন্যায়পরায়ণতার অনুশীলন করতেন।

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا

“মানুষদের সঙ্গে সদাচরণ করো।” (সূরা বাকারা: ৮৩)

সমাজে আত্মশুদ্ধির প্রভাব:রাসূল ﷺ এর আত্মশুদ্ধির জীবন সমাজে ন্যায়, সৌজন্য ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিল। অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ছিলেন। মানুষের হৃদয়ে শান্তি, সম্মান ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন। রাসূল ﷺ এর জীবন থেকে আমরা শিখি— আত্মশুদ্ধি হলো জীবনের মূল লক্ষ্য। দোয়া, ইবাদত, নৈতিকতা ও তাওবা চর্চা আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আল্লাহর স্মরণ ও নফস নিয়ন্ত্রণ আত্মশুদ্ধির প্রধান উপাদান।

وَزَكَّاهَا وَذَكِّرْ نَفْسَكَ بِالذِّكْرِ

“নিজেকে পরিশুদ্ধ করো এবং আল্লাহর স্মরণে মনোযোগ দাও।” (সূরা আল-মুজাম্মিল: ৮)

রাসূল ﷺ এর প্রতিটি কর্ম, দোয়া ও আচরণ আত্মশুদ্ধির শিক্ষা দেয়। আমরা তার অনুসরণ করে নিজের নফসকে পরিশুদ্ধ করতে পারি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করাই আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত লক্ষ্য।

রাসূল ﷺ আমাদের জন্য জীবন্ত দৃষ্টান্ত, যিনি দেখিয়েছেন কীভাবে অন্তরের কলুষ দূর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়।

সাহাবায়ে কেরামের জীবনে আত্মশুদ্ধি

সাহাবায়ে কেরামরা নবী ﷺ এর সরাসরি শিষ্য এবং ইসলামের আদর্শ ব্যক্তিত্ব। তারা শুধু বাহ্যিক ইবাদত পালন করতেন না, বরং অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও নৈতিক চরিত্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন।

হযরত আবু বকর (রা.)--রাতের গভীর সময়ে ঘুম থেকে উঠে নিজের আমল পর্যালোচনা করতেন। তিনি সততা, বিনয় এবং নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখতেন। সাহাবাদের মধ্যে আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য পরিচিত।

হযরত আলী (রা.)--রাগ ও অহংকার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। ন্যায়পরায়ণ ও ধৈর্যশীলতার জন্য সাহাবাদের মধ্যে সুপরিচিত। তার জীবন দেখায় কিভাবে আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য দৈনন্দিন জীবনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

সাহাবাদের আত্মশুদ্ধি কেবল ব্যক্তিগত নয়, সমাজকেন্দ্রিকও ছিল। তারা নিজেদের চরিত্র ও আখলাকের মাধ্যমে সমাজে ন্যায়, শান্তি ও সৌজন্য প্রতিষ্ঠা করতেন। বিনয় ও সহানুভূতি তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ ছিল। মানুষকে দয়া, সহমর্মিতা এবং ঈমানের পথে অনুপ্রাণিত করতেন।

সাহাবাদের জীবন থেকে আমরা শিখি—আত্মশুদ্ধি জীবনের প্রধান লক্ষ্য। দোয়া ও ইখলাস চর্চা অন্তরের কলুষ দূর করে। নৈতিক জীবন, ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা আত্মাকে শক্তিশালী করে। খারাপ অভ্যাস ও মন্দ চিন্তা পরিত্যাগ অপরিহার্য। সাহাবায়ে কেরামের জীবন আমাদের জন্য আত্মশুদ্ধির জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

তারা দেখিয়েছেন কিভাবে নৈতিক চরিত্র, অন্তরের পরিশুদ্ধি এবং আল্লাহভীরু জীবন অনুসরণের মাধ্যমে আত্মাকে কলুষমুক্ত রাখা যায়।

আমাদের জন্য শিক্ষা হলো—নিজের নফস পরিশুদ্ধ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল পথ। “সাহাবাদের জীবন হলো আলোর পথ যা আমাদেরকে অন্তরের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়।” o

আত্মশুদ্ধির ধাপসমূহ

আত্মশুদ্ধি বা তায়কিয়াতুন নফস হলো মানুষের অন্তরের অপবিত্রতা, খারাপ চিন্তা, নৈতিক দুর্বলতা এবং নীচ প্রবৃত্তিগুলো থেকে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে একে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা। এটি কোনো একদিনের কাজ নয়, বরং একটি দীর্ঘ ও ধৈর্যের সাধনার প্রক্রিয়া। আত্মশুদ্ধির জন্য মানুষকে ধাপে ধাপে নিজের ভেতরের পরিবর্তন ঘটাতে হয়।

প্রথম ধাপ হলো নিজেকে চেনা ও আত্মসমালোচনা করা। মানুষকে বুঝতে হবে সে কে, তার জীবনের লক্ষ্য কী, এবং তার ভেতরে কী ধরনের দুর্বলতা বা পাপাচার কাজ করছে। নিজের ভুল, গুনাহ ও নৈতিক ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হওয়াই শুদ্ধতার প্রথম ধাপ। এ আত্মসমালোচনা মানুষকে নিজের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং অনুতপ্ত হওয়ার পথ খুলে দেয়।

দ্বিতীয় ধাপ হলো তাওবা ও আত্মসমর্পণ। আল্লাহর কাছে বিনয় ও অনুতাপের সঙ্গে ফিরে আসা, পূর্বের অন্যায় ও গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আত্মশুদ্ধির মূল চাবিকাঠি। তাওবা কেবল মুখের কথা নয়, বরং অন্তরের গভীর অনুশোচনা এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বিরত

থাকার দৃঢ় অঙ্গীকার। যখন মানুষ আল্লাহর সামনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে, তখন তার হৃদয় নরম হয়, অহংকার ভেঙে যায় এবং শুদ্ধতার আলো ফুটে ওঠে।

তৃতীয় ধাপ হলো নিয়মিত ইবাদত ও যিকর। নামাজ, রোজা, কুরআন তিলাওয়াত, দোয়া ও আল্লাহর স্মরণ আত্মাকে প্রশান্ত করে এবং পাপ থেকে দূরে রাখে। ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে, যা আত্মাকে দৃঢ় ও পরিশুদ্ধ করে তোলে। নিয়মিত যিকর হৃদয়কে আলোকিত করে, ভুলে যাওয়া আত্মাকে জাগ্রত করে এবং খারাপ চিন্তাগুলোকে দূরে সরিয়ে দেয়।

চতুর্থ ধাপ হলো অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও খারাপ অভ্যাস পরিহার। আত্মশুদ্ধি মানে নিজের প্রবৃত্তি, রাগ, লোভ, হিংসা, অহংকার, কপটতা ও কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষ যত বেশি নিজের নফসকে সংযত করতে পারে, তত বেশি সে পরিশুদ্ধ হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণ মানেই নিজের ভেতরের দানবকে বশে আনা এবং নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা। এটি ধারাবাহিক অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করা যায়।

পঞ্চম ধাপ হলো সৎগুণ অর্জন ও সৎকাজে অভ্যস্ত হওয়া। আত্মশুদ্ধির প্রকৃত রূপ প্রকাশ পায় যখন মানুষ দয়া, ক্ষমা, বিনয়, ধৈর্য, উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার মতো গুণগুলো অর্জন করে। শুধু পাপ থেকে বিরত থাকা নয়, বরং ভালো কাজের অভ্যাস গড়ে তোলাও আত্মশুদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষ যত বেশি সৎকাজে যুক্ত হয়, তার আত্মা ততই প্রশান্ত হয়।

ষষ্ঠ ধাপ হলো সমাজে নৈতিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। আত্মশুদ্ধি কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য নয়, বরং সমাজে শান্তি, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার পরিবেশ সৃষ্টির জন্যও প্রয়োজন। একজন শুদ্ধ আত্মার মানুষ অন্যদেরও সৎ পথে আহ্বান করে, অন্যায়ের বিরোধিতা করে এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। তার আচরণ, ভাষা ও কাজের মাধ্যমে সে মানুষের জন্য উদাহরণ হয়ে ওঠে।

সবশেষে, আত্মশুদ্ধির শেষ ধাপ হলো আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নির্ভরতা ও ঈমানের দৃঢ়তা। আত্মশুদ্ধি সফল হয় তখনই, যখন মানুষ সমস্ত কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য করে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। যতদিন মানুষ আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখে, ততদিন তার আত্মা পরিশুদ্ধ ও স্থির থাকে।

অতএব, আত্মশুদ্ধি একটি ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া যা আত্মজ্ঞান, তাওবা, ইবাদত, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সৎগুণ অর্জন এবং সমাজকল্যাণের মাধ্যমে পূর্ণতা পায়। একজন মানুষ যত বেশি এই ধাপগুলো অনুসরণ করে, ততই সে আল্লাহর প্রিয় ও সফল বান্দায় পরিণত হয়।

আত্মশুদ্ধিতে বাধা

আত্মশুদ্ধি অর্জন সহজ নয়। জীবনের পথে অনেক অন্তর্গত ও বহিঃগত বাধা আসে। যদি এই বাধাগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত না করা হয়, তবে একজন মুসলমানের আত্মা কলুষমুক্ত হতে পারে না।

প্রধান বাধাসমূহের মধ্যে রয়েছে—

নফসের খারাপ প্রবৃত্তি, শয়তানের প্রলুব্ধি, অহংকার ও হিংসা, অলসতা ও উদাসীনতা, খারাপ সঙ্গ।

আল্লাহ ও নবী ﷺ আমাদের সতর্ক করেছেন এই বাধাসমূহ থেকে সতর্ক থাকার জন্য।

আত্মশুদ্ধিতে প্রধান অন্তর্গত বাধাসমূহ—

অহংকার: অহংকার হলো নিজের ক্ষমতা, শিক্ষা বা অবস্থান নিয়ে অহংকার করা। এটি আত্মশুদ্ধি অর্জনের পথে প্রধান বাধা। অহংকার ব্যক্তি ও সমাজকে কলুষিত করে।

হিংসা ও বিদ্বেষ: অন্যের সাফল্য বা সম্পদে হিংসা করা আত্মশুদ্ধিকে ব্যাহত করে। হিংসা হৃদয়কে বিষাক্ত করে, নফসকে দুর্বল করে এবং মনকে অশান্ত করে।

লোভ ও ক্রোধ: অতিরিক্ত লোভ এবং রাগ নফসকে নিয়ন্ত্রণ করতে বাধা দেয়। একজন মানুষ যদি লোভ এবং রাগের শিকার হয়, তবে তার নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হয়।

মিথ্যা ও গীবত: মিথ্যা বলা বা অন্যের মানহানি করা আত্মাকে কলুষিত করে। গীবত ও মিথ্যা আচরণ ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে নৈতিক দুর্বলতা তৈরি করে।

বহিঃগত বাধা ও প্রলুব্ধি—

নফসের প্রলুব্ধি: শয়তানের প্রলুব্ধি এবং নিজের খারাপ ইচ্ছা আত্মশুদ্ধিকে ব্যাহত করে। যখন মানুষ নিজের খারাপ প্রবৃত্তির প্রতি অসতর্ক থাকে, তখন পাপের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়।

অলসতা ও উদাসীনতা: নামাজ, দোয়া, কোরআন পাঠ ও নেক আমল থেকে বিরত থাকা আত্মশুদ্ধির প্রধান বাধা। নিয়মিত ইবাদত ও আত্ম-পর্যালোচনা ছাড়া আত্মা কলুষমুক্ত হয় না।

খারাপ সঙ্গ: খারাপ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নৈতিকতা ও আত্মার শুদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। ভালো মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া আত্মশুদ্ধির জন্য সহায়ক।

আত্মশুদ্ধিতে বাধা শুধুমাত্র বাহ্যিক নয়, অন্তর্গত কারণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমাধান ও পথ:

নিয়মিত তাওবা ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা। নামাজ, কোরআন পাঠ ও দোয়া চর্চা। ধৈর্য, কৃতজ্ঞতা ও সদাচরণ চর্চা। ভালো মানুষদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা। খারাপ অভ্যাস ও চিন্তাভাবনা পরিত্যাগ করা। আত্মশুদ্ধির পথ প্রতিনিয়ত চর্চা, সতর্কতা ও ধৈর্যের মাধ্যমে সুগম হয়। যে ব্যক্তি নিজেকে কলুষমুক্ত রাখে, আল্লাহ তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

"আত্মশুদ্ধি হলো সেই আলো, যা মানুষের জীবনকে পাপ ও অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যায়।"

আত্মশুদ্ধির ফলাফল দুনিয়া ও আখিরাতে

আত্মশুদ্ধি বা নফসের পরিশুদ্ধি একজন মু'মিনের জীবনে এক অভূতপূর্ব গুরুত্ব বহন করে। যখন একজন ব্যক্তি তার অন্তরের অপ্রীতিকর গুণাবলী যেমন অহংকার, ঈর্ষা, হিংসা, লোভ এবং আল্লাহর প্রতি অবাধ্যতার অভ্যাস থেকে মুক্তি অর্জন করে, তখন তার মন ও জীবন দুইই আলোকিত হয়। আত্মশুদ্ধি মানুষের ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করে; একটি পরিশুদ্ধ অন্তর মানুষকে সহনশীল, দয়া, ধৈর্য এবং ন্যায়পরায়ণ করে তোলে। দুনিয়াতে এর প্রভাব স্পষ্টভাবে দেখা যায়—শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মানসিক শান্তি এবং অভ্যন্তরীণ তৃপ্তি একজন আত্মশুদ্ধ মানুষের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকে।

আত্মশুদ্ধি শুধুমাত্র দুনিয়ার জন্যই নয়, বরং আখিরাতেও অপরিসীম সাফল্য ও বরকত বয়ে আনে। কোরআনে আল্লাহ বলেন:

"قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ" (সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:১-২)

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই মু'মিনরা সফল হয়েছে, যারা নিজেদের সালাতে খুশু' ও মনোযোগী।"

এই আয়াত আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে একজন মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী সাফল্যের অধিকারী হয়।

আত্মশুদ্ধি আত্মসচেতনতা ও ধ্যানের মাধ্যমে অর্জিত হয়। একজন মানুষ যখন নিজের অন্তরের দুষ্ট গুণাবলী চিহ্নিত করে এবং সেগুলি পরিহার করার চেষ্টা করে, তখন সে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে। এর মাধ্যমে ব্যক্তি দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মকাণ্ডে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হয়। দুনিয়ায় এর সুফল হলো শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক, আত্মসম্মান, এবং নৈতিক মানদণ্ডের দৃঢ়তা। আর আখিরাতে এর সুফল যেমন জান্নাতের সঙ্গ, আল্লাহর রহমত, এবং চিরস্থায়ী প্রশান্তি, যা একজন মু'মিনের চিরস্থায়ী লক্ষ্য।

আত্মশুদ্ধি কেবল ব্যক্তিগত উন্নতি নয়, এটি সমাজে ন্যায়পরায়ণতা ও মানবিক মূল্যবোধের প্রসার ঘটায়। একটি পরিশুদ্ধ অন্তর মানুষের সমাজে দয়া, সদাচরণ এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণা দেয়। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যেই মানুষ তার অন্তরের দুষ্ট গুণাবলী পরিত্যাগ করলে, তার দুনিয়া ও আখিরাতে—উভয়েই বরকত ও সাফল্য বৃদ্ধি পায়। তাই আত্মশুদ্ধি হল একজন মু'মিনের জীবন ও আখিরাতে সফলতার মূল চাবিকাঠি।

সংক্ষেপে, আত্মশুদ্ধি মানুষের জীবনকে দুনিয়া ও আখিরাতে সকল ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করে। এটি আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টির দ্বার খুলে দেয়, ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে উন্নত করে, এবং তাকে চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির দিকে পরিচালিত করে। আত্মশুদ্ধি ছাড়া কোনো সত্যিকারের নৈতিকতা

বা আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নয়, কারণ এটি মানুষের অন্তরের পরিপক্বতা ও সত্যিকারের ঈমানের প্রকাশ।

সত্যবাদিতা ও আমানতদারিতা

সত্যবাদিতা মানবজীবনের এমন একটি মহৎ গুণ, যা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিকে দৃঢ় করে তোলে। সত্যবাদিতা বলতে বোঝায় — কথায়, কাজে ও আচরণে সত্য ও সঠিকের প্রতি অটল থাকা। ইসলাম ধর্মে এটি একটি মৌলিক নৈতিক গুণ হিসেবে বিবেচিত। কারণ ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের অন্তর ও বাহ্যিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা ও সত্যতার নির্দেশ দেয়।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সত্য কথা ও ন্যায়ের পথে চলা তার স্বভাবজাত। কিন্তু যখন মানুষ লোভ, ভয় বা স্বার্থের কারণে মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখন সে নিজের নৈতিকতা হারিয়ে ফেলে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ কারণেই কুরআন ও হাদীসে সত্যবাদিতাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও।” (সূরা আত-তাওবা, ১১৯)

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা সত্যবাদিতাকে তাকওয়ার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, যারা আল্লাহভীরু, তারা কখনো মিথ্যা বলতে পারে না এবং সর্বদা সত্যের পথে দৃঢ় থাকে। সত্যবাদিতা শুধু মুখের কথা নয়; এটি এমন এক চরিত্র, যা একজন মানুষকে বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও সম্মানিত করে তোলে।

সুতরাং, একজন প্রকৃত মুসলমানের জীবনে সত্যবাদিতা শুধু নৈতিক গুণ নয়, বরং ঈমানের প্রতিফলন। যে ব্যক্তি সত্যবাদী, সে আল্লাহর নিকট প্রিয় হয় এবং সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে — কথায়, কাজে ও আচরণে — আমাদের উচিত সত্যবাদিতার চর্চা করা, যাতে আমরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারি।

কোরআন ও হাদীসে সত্যবাদিতার গুরুত্ব

সত্যবাদিতা ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক গুণ। ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের প্রতিটি কর্মে সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যের অনুসরণের শিক্ষা দেয়। কোরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বারবার সত্য কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন এবং মিথ্যার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

হাদীসেও সত্যবাদিতার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“সত্যবাদিতা মানুষকে নেকির দিকে নিয়ে যায়, আর নেকি মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। একজন মানুষ সব সময় সত্য কথা বলতে থাকে, যতক্ষণ না সে আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়। আর মিথ্যা পাপের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

এই হাদীসটি আমাদের শেখায় যে, সত্যবাদিতা শুধু মুখের কথা নয় বরং এটি চরিত্রের প্রতিফলন। যে ব্যক্তি সত্যবাদী, তার অন্তরও পবিত্র থাকে, এবং সে আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে ওঠে।

রাসূল ﷺ-এর জীবন ছিল সত্যবাদিতার সর্বোত্তম উদাহরণ। নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেই মক্কার মানুষ তাঁকে “আল-আমিন” (বিশ্বাসযোগ্য) ও “আস-সাদিক” (সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি সত্যবাদিতা ও আমানতদারির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এমনকি তাঁর শত্রুরাও কখনো তাঁর মুখে মিথ্যা কথা শুনতে পায়নি।

একটি ঘটনার উদাহরণ হলো— একবার কুরাইশদের একদল লোক নবী ﷺ-এর শত্রু হলেও তাঁর কাছে তাদের মূল্যবান জিনিস রাখত, কারণ তাঁরা জানত যে, মুহাম্মদ (স.) কখনো প্রতারণা করবেন না। হিজরতের সময়ও তিনি আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দেন যেন সেই আমানতগুলো যথাযথভাবে মালিকদের ফেরত দেয়। এটি প্রমাণ করে যে সত্যবাদিতা শুধু কথায় নয়, কাজে ও আচরণেও প্রকাশ পেতে হয়।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, সত্যবাদিতা হলো ঈমানের প্রতীক এবং মিথ্যা হলো কপটতা ও পাপের মূল। সমাজে শান্তি, ন্যায় ও আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সত্যবাদিতার অনুশীলন অপরিহার্য। সত্যবাদী মানুষ আল্লাহর প্রিয়, মানুষেরও প্রিয়। তাই আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্য বলা, সত্য অনুসরণ করা এবং মিথ্যা থেকে দূরে থাকা।

সত্যবাদিতা এমন একটি আলোকিত গুণ যা মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা এনে দেয়। কোরআন ও হাদীসের নির্দেশ মেনে সত্যবাদী জীবন গঠন করলেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যোগ্যতা অর্জন করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

সাহাবিদের জীবনে সত্যবাদিতার উদাহরণ

সত্যবাদিতা মানব জীবনের অন্যতম মহান গুণ। ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যবাদিতা শুধু কথায় নয়, বরং জীবনের প্রতিটি কাজে, আচরণে, ও লেনদেনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

আবু বকর (রাঃ)-এর সত্যবাদিতা: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিলেন “আস-সাদিক” (সত্যবাদী) উপাধিতে ভূষিত। যখন

মিরাজের ঘটনা শুনে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিল, তখন আবু বকর (রাঃ) বিনা দ্বিধায় বলেছিলেন —

“যদি মুহাম্মদ ﷺ বলে থাকেন, তাহলে অবশ্যই সত্য।”

এই অটল বিশ্বাস ও সত্যকে সমর্থনের কারণে রাসূল ﷺ তাকে “আস-সিদ্দিক” (অত্যন্ত সত্যনিষ্ঠ) উপাধি দেন। তার সত্যবাদিতা মুসলমানদের হৃদয়ে এমন দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি রাসূল ﷺ এর প্রতিটি কথায় নিঃশর্ত আস্থা রাখতেন।

আবু বকর (রাঃ) খলিফা হওয়ার পরও সত্য ও ন্যায়ের পথে অটল থাকেন। তিনি বলেছিলেন —

“তোমরা যদি আমাকে সঠিক পথে দেখো, তাহলে আমার সহযোগিতা করো; আর যদি আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হই, তাহলে আমাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে দাও।”

এ বক্তব্য তার অন্তরের সত্যনিষ্ঠা ও বিনয়ের পরিচায়ক।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর সত্যনিষ্ঠ জীবন:হযরত উমর (রাঃ) ছিলেন ন্যায় ও সত্যের প্রতীক। তিনি কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেননি এবং কারো পক্ষপাত করেননি। খলিফা হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তিনি বারবার ঘোষণা করতেন—

“সত্যের পথে থাকলে আমি তোমাদের সামনে থাকব, আর যদি মিথ্যার পথে যাই, তাহলে তোমরা আমাকে সোজা করে দেবে।”

একবার এক সাধারণ মানুষ তাকে বলেছিল, “হে উমর, তুমি আমাদের ওপর কঠোর।” তখন উমর (রাঃ) উত্তর দিলেন —

“যদি আমি সত্য থেকে বিচ্যুত হই, তবে তোমরা তোমাদের তরবারি দিয়ে আমাকে সোজা করে দিও।”

এ উত্তরে সাহাবারা বলেছিলেন, “আল্লাহর কসম! যদি তুমি সত্য থেকে সরে যাও, আমরা তোমাকে ঠিকই সোজা করে দেব।”

উমর (রাঃ) সত্যবাদিতা এতটাই ভালোবাসতেন যে, নিজের আত্মীয়স্বজন বা ঘনিষ্ঠজনদের বিরুদ্ধেও ন্যায়বিচারে আপস করতেন না। তিনি বলতেন —

“সত্য না বললে সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।”

উসমান (রাঃ)-এর সততা ও সত্যবাদিতা: হযরত উসমান (রাঃ) ছিলেন বিনয়ী, সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি। ব্যবসায়ী জীবনে তিনি কখনো মিথ্যা বলতেন না বা প্রতারণা করতেন না। তার বাণিজ্যে সততা এতই প্রসিদ্ধ ছিল যে, মদিনার বাজারে মানুষ বলত — “উসমানের কাছ থেকে কিনলে ঠকতে হবে না।”

তিনি যখন খলিফা হন, তখনও সত্যবাদিতা তাঁর নীতিতে পরিণত হয়। তিনি কোনো অন্যায়ের সাথে আপস করেননি, এমনকি নিজের জীবনের বিনিময়েও। অবশেষে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করেই তিনি শহীদ হন।

আলী ইবনু আবি তালিব (রাঃ)-এর সত্যের প্রতি আনুগত্য: হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ইসলামের জ্ঞানী, সাহসী ও সত্যবাদী সাহাবি। নবী ﷺ তাকে “আল-আসদুল্লাহ” (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। একবার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তার নিজের আত্মীয় একটি মামলায় পক্ষ হয়ে আসে। কিন্তু আলী (রাঃ) বলেন —

“বিচারে আত্মীয়-পরিচয়ের স্থান নেই; সত্য যার, বিচার তার পক্ষে যাবে।”

এমনকি রাসূল ﷺ এর নির্দেশে যখন তিনি হিজরতের রাতে রাসূলের বিছানায় শুয়ে শত্রুদের আক্রমণের মুখে পড়েছিলেন, তখনও সত্য ও আমানতের খাতিরে তিনি মক্কার মানুষের আমানত ফেরত না দেওয়া পর্যন্ত মিথ্যা বা ভয়ের আশ্রয় নেননি।

কা'ব ইবন মালিক (রাঃ)-এর অনুতাপ ও সত্যবাদিতা: তাবুক যুদ্ধের ঘটনায় সাহাবি কা'ব ইবন মালিক (রাঃ)-এর সত্যবাদিতা ইসলামী ইতিহাসে অনন্য উদাহরণ। তিনি যুদ্ধ থেকে অনুপস্থিত থাকলেও, যখন রাসূল ﷺ তাকে কারণ জিজ্ঞেস করেন, তিনি মিথ্যা অজুহাত না দেখিয়ে সোজাসাপ্টা সত্য বলেন —

“হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোনো অজুহাত নেই; আমি অলসতা করেছি।”

তার এই সত্যবাদিতার কারণে রাসূল ﷺ তাকে কিছুদিন বর্জন করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর তাওবা কবুল করেন। কোরআনে এর উল্লেখ আছে —

এই ঘটনার মাধ্যমে প্রমাণ হয়, সত্যবাদিতা মানুষকে শেষ পর্যন্ত সম্মানিত করে, যদিও শুরুতে কষ্ট দিতে পারে।

অন্যান্য সাহাবিদের সত্যনিষ্ঠ আচরণ: অন্যান্য বহু সাহাবিও সত্যবাদিতার উদাহরণ রেখে গেছেন। যেমন -

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) ব্যবসায়িক লেনদেনে কখনো মিথ্যা ও প্রতারণা করতেন না। সালমান আল-ফারসি (রাঃ) দাসত্বের জীবনেও সত্য বলতেন, ফলে তার প্রভুরা তার ওপর আস্থা রাখত।

আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ) ছিলেন “উম্মাহর আমিন” — কারণ তিনি কখনো সত্য গোপন করতেন না।

সাহাবিদের জীবনে সত্যবাদিতা ছিল ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা জানতেন, মিথ্যা মানুষের ঈমান নষ্ট করে এবং সমাজে অশান্তি ছড়ায়। তাই তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যের ওপর অবিচল থেকেছেন, এমনকি মৃত্যু বা কষ্টের মুখেও।

আজকের মুসলমানদের উচিত সাহাবিদের এই গুণকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা। কারণ সত্যবাদিতা শুধু একটি নৈতিক গুণ নয়, বরং এটি জাহ্নাতের পথ প্রশস্ত করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“সত্যবাদিতা নেকীর দিকে করে, আর নেকী জাহ্নাতের দিকে করে।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

সুতরাং, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সাহাবিদের মতো সত্যবাদিতা অবলম্বন করাই হবে ইসলামী চরিত্র গঠনের প্রকৃত নিদর্শন।

একজন মানবের জীবনে সত্যবাদিতার গুরুত্ব

সত্যবাদিতা মানব জীবনের এমন এক মহৎ গুণ, যা মানুষকে সমাজে মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত করে তোলে। সত্যবাদিতা মানে হলো কথায়, কাজে এবং চিন্তায় সত্য ও বাস্তবতার অনুসরণ করা। এটি এমন এক নৈতিক গুণ যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং তার চরিত্রকে উজ্জ্বল করে তোলে। সত্যবাদী মানুষ কখনো মিথ্যা বলে না, প্রতারণা করে না এবং অন্যের ক্ষতি করে না। সমাজে একজন সত্যবাদী ব্যক্তির প্রতি সবার আস্থা জন্মায়, তার কথায় বিশ্বাস করা যায়। তাই সত্যবাদিতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক ও জাতীয় জীবনেও শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানুষের চরিত্রের মূল ভিত্তি হলো সততা ও সত্যবাদিতা। একজন সত্যবাদী মানুষ সবসময় আল্লাহর ভয় মনে রাখে এবং ন্যায় ও সৎ কাজের প্রতি দৃঢ় থাকে। ইসলাম ধর্মে সত্যবাদিতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

“অতএব, সত্যবাদিতা কেবল একটি নৈতিক গুণ নয়, বরং এটি জাহ্নাত লাভের পথও। সত্যবাদী মানুষ সমাজে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তার কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকে, ফলে সে অন্যের জন্য অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, মিথ্যাবাদিতা সমাজে বিশৃঙ্খলা, অবিশ্বাস ও অশান্তি সৃষ্টি করে। যে সমাজে মানুষ সত্যবাদী হয়, সেখানে পারস্পরিক আস্থা, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবারের মধ্যেও সত্যবাদিতা সুখ ও শান্তির মূল চাবিকাঠি। অভিভাবক যদি সন্তানদের সামনে সবসময় সত্য কথা বলেন, তবে সন্তানরাও ছোটবেলা থেকেই সত্য বলতে অভ্যস্ত হয়।

সত্যবাদিতা মানুষের অন্তরে প্রশান্তি আনে। মিথ্যার বোঝা বহন করতে হয় না, ফলে মন থাকে হালকা ও নির্মল। একজন সত্যবাদী ব্যক্তি সবসময় আত্মবিশ্বাসী থাকে, কারণ সে জানে তার কোনো গোপন মিথ্যা তাকে বিপদে ফেলবে না। সত্যবাদিতা মানুষকে নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সফলতার পথে এগিয়ে দেয়।

পরিশেষে বলা যায়, সত্যবাদিতা এমন এক আলো যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যায়। এটি ছাড়া মানুষ কখনো প্রকৃত অর্থে ন্যায়পরায়ণ বা ধার্মিক হতে পারে না। তাই

আমাদের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সত্যকে ধারণ করা, মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকা। কারণ, সত্যবাদিতা শুধু আমাদের দুনিয়ার জীবন নয়, আখিরাতের মুক্তির পথও উন্মুক্ত করে। সত্যবাদী মানুষই প্রকৃত সফল ও সম্মানিত মানুষ — আল্লাহর প্রিয় বান্দা।

আমানতদারিতার অর্থ ও তাৎপর্য

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী সমাজে মানবিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠে আমানতদারিতার ওপর। “আমানত” শব্দটি আরবি أمانة থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো দায়িত্ব, বিশ্বাস, নিরাপত্তা ও নির্ভরযোগ্যতা। আর “আমানতদারিতা” বলতে বোঝায় সেই দায়িত্ব, বিশ্বাস বা কর্তব্য যথাযথভাবে রক্ষা ও পালন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে, আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর যে সকল দায়িত্ব অর্পণ করেছেন—তা বিশ্বস্ততা ও সততার সঙ্গে পালন করাই আমানতদারিতা। এটি শুধু একটি নৈতিক গুণ নয়; বরং ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ। আমানতদারিতা শুধু সম্পদ বা বস্তু রক্ষা করা নয়, বরং জীবনের সকল দায়িত্ব, যেমন ইবাদত, কথা, কাজ, পদ, দায়িত্ব ও আচরণের সঠিক ব্যবস্থাপনাও এর অন্তর্ভুক্ত। একজন আমানতদার মানুষ এমন ব্যক্তি, যিনি আল্লাহ ও মানুষের প্রতি নিজের দায়িত্ব সঠিকভাবে বুঝে তা পালন করেন। ইসলামে আমানতদারিতার গুরুত্ব এতটাই যে, এটি ছাড়া সমাজে স্থিতি, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

আল্লাহ তাআলা কোরআনে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা আমানতসমূহ তাদের হকদারদের নিকট পৌঁছে দেবে।” (সূরা আন-নিসা- ৪:৫৮)

এই আয়াত থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, আমানত রক্ষা করা শুধু নৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি আদেশ। মানুষ যখন আমানতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে, তখন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। অন্যদিকে, যে ব্যক্তি আমানতের খিয়ানত করে, সে কেবল মানুষের নয়, বরং আল্লাহরও নাফরমান হয়ে যায়।

কোরআনের আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেন—

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۚ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“আমি আসমান, জমিন ও পর্বতসমূহের উপর আমানত প্রস্তাব করেছিলাম, কিন্তু তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছিল এবং ভীত হয়েছিল; আর মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে ছিল অত্যাচারী ও অজ্ঞ।” (সূরা আল-আহযাব -৩৩:৭২)

এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আমানত পালন করা একটি কঠিন দায়িত্ব, যা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কেবল মানুষই গ্রহণ করেছে। তাই আমানতের সঠিক রক্ষা করা মানুষকে মহান মর্যাদা প্রদান করে, আর এর খিয়ানত মানুষকে লাঞ্ছনার দিকে ঠেলে দেয়।

আমানতদারিতা সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের একটি অপরিহার্য নৈতিক মূল্যবোধ। পরিবার, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন কিংবা ধর্মীয় দায়িত্ব—সব ক্ষেত্রেই আমানতদারিতা থাকলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। একজন শিক্ষক যদি শিক্ষার দায়িত্বকে আমানত হিসেবে দেখে, একজন বিচারক যদি বিচারের আসনকে আমানত হিসেবে বোঝে, একজন ব্যবসায়ী যদি লেনদেনকে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে—তবে সমাজে কখনো অন্যায়, প্রতারণা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

“যার মধ্যে আমানতদারিতা নেই, তার মধ্যে ঈমানও নেই।” (সহিহ মুসলিম)

এই হাদীসটি প্রমাণ করে যে, আমানতদারিতা শুধু সামাজিক গুণ নয়, বরং ঈমানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। মুসলমান হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হলো—আমরা যেন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সততা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় দেই। আমানতের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, যা আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ দেখায়।

আমানতদারিতার প্রকারভেদ

ইসলামে আমানতদারিতা এমন একটি গুণ যা একজন মুসলমানের জীবনব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে বিরাজমান। এটি শুধু সম্পদ বা দায়িত্ব রক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আল্লাহ, মানুষ এবং সমাজ—এই তিনের প্রতিই দায়িত্বশীল আচরণ প্রদর্শন করা আমানতদারিতার অংশ। ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, আমানতদারিতার বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, যা মানুষের জীবন ও সমাজে ভারসাম্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করে। নিচে আমানতদারিতার প্রধান প্রকারভেদ ও তার বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১ আল্লাহর প্রতি আমানত : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আমানত হলো আল্লাহর প্রতি আমানত। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বুদ্ধি, জ্ঞান ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, যাতে সে সঠিক ও ভুলের পার্থক্য বুঝে আল্লাহর নির্দেশ পালন করে। সুতরাং মানুষের উপর ফরজ করা নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ ইত্যাদি ইবাদত পালন করা এক প্রকার আমানত। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“হে মুমিনগণ! আল্লাহ ও রাসূলের সাথে খিয়ানত করো না, আর তোমাদের নিকট যে আমানত রাখা হয়েছে, তাতে খিয়ানত করো না, অথচ তোমরা জানো।” (সূরা আনফাল -৮:২৭)

এই আয়াত স্পষ্ট করে যে, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও ইবাদতের দায়িত্ব একটি আমানত। যদি কেউ নামাজ, রোজা, যাকাত বা অন্য কোনো ইবাদত অবহেলা করে, তবে সে আসলে এই আমানতের খিয়ানত করছে। তাই একজন মুমিনের প্রথম দায়িত্ব হলো আল্লাহর আদেশ যথাযথভাবে পালন করা এবং তাঁর প্রতি নিজের ঈমান ও আনুগত্য বজায় রাখা।

মানুষের প্রতি আমানত: দ্বিতীয় প্রকার আমানত হলো মানুষের প্রতি আমানত, যা সমাজে বিশ্বাস ও সম্পর্কের ভিত্তি গড়ে তোলে। মানুষের মাঝে সম্পদ, দায়িত্ব, গোপনীয়তা, প্রতিশ্রুতি ও কথার ক্ষেত্রে আমানতদারিতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যেমন, কেউ যদি কোনো সম্পদ সংরক্ষণের জন্য অন্যের কাছে রাখে, তবে সেটি সঠিকভাবে ফেরত দেওয়া আমানত রক্ষা করা। তেমনি কারও ব্যক্তিগত বা গোপন তথ্য ফাঁস না করা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা, এবং কারও সাথে চুক্তিতে সততা বজায় রাখা—এসবই আমানতদারিতার অংশ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ

“যে ব্যক্তি খিয়ানত করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন একটি পতাকা স্থাপন করা হবে, এবং বলা হবে—এই হলো অমুক ব্যক্তির খিয়ানত।” (সহিহ বুখারী)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সাথে খিয়ানত করে, সে দুনিয়ায় যেমন লাঞ্চিত হয়, তেমনি আখিরাতেও কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে।

সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমানত : তৃতীয় প্রকার আমানত হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি আমানত। সমাজের প্রতিটি পদ ও দায়িত্ব এক প্রকার আমানত। একজন শিক্ষক, বিচারক, নেতা বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা—প্রত্যেকের দায়িত্ব হলো তার কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা এবং অন্যায়ের পথ পরিহার করা।

রাসূল ﷺ বলেছেনঃ

“যখন দায়িত্ব অযোগ্য ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর।” (সহিহ

বুখারী)

এই হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সমাজে ন্যায়ের ভিত্তি টিকিয়ে রাখতে সঠিক ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করাই প্রকৃত আমানতদারিতা। যদি কেউ নিজের স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করে, তবে সে এই আমানতের খিয়ানত করছে।

ইসলাম চায় এমন সমাজ যেখানে নেতা জনগণের সেবা করবে, শিক্ষক শিক্ষার্থীর উন্নয়নকে লক্ষ্য রাখবে, ব্যবসায়ী প্রতারণা ছাড়া বাণিজ্য করবে—এই প্রত্যেকটি কাজই আমানত রক্ষার অংশ।

আত্মার প্রতি আমানত: আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকার হলো নিজ আত্মার প্রতি আমানত। আল্লাহ মানুষকে দেহ, মন ও আত্মা দিয়েছেন—এগুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করা, হারাম থেকে বিরত থাকা, নিজের নৈতিক চরিত্র সংরক্ষণ করা—সবই আত্মার প্রতি আমানত রক্ষা করা। নিজের সময়, জ্ঞান, প্রতিভা ও সুযোগের সঠিক ব্যবহার করাও এই আমানতের অংশ। যেমন, কেউ যদি নিজের শরীরকে হারাম খাদ্য বা কাজের মাধ্যমে দূষিত করে, তবে সে নিজের প্রতি আমানতের খিয়ানত করছে। তাই ইসলামে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মশুদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা একজন মানুষকে সত্যিকারের আমানতদার বানায়।

অতএব, আমানতদারিতা শুধু সম্পদ বা কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি আল্লাহ, মানুষ, সমাজ এবং নিজের প্রতি দায়িত্বশীলতার সমষ্টি। ইসলাম চায় এমন এক সমাজ যেখানে প্রত্যেকে নিজের দায়িত্ব বুঝে তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করবে। আমানতের সঠিক রক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম, আর খিয়ানত আল্লাহর রোষের কারণ।

একজন সত্যিকার মুসলমানের পরিচয় হলো—সে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, মানুষের সাথে ন্যায় করে, সমাজের দায়িত্ব পালন করে এবং নিজের আত্মাকে পবিত্র রাখে। এভাবেই আমানতদারিতা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের সৌন্দর্যকে প্রতিফলিত করে।

রাসূল ﷺ এর জীবনে আমানতদারিতার দৃষ্টান্ত

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ আমানতদার ব্যক্তি। নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেই তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা দেখে মক্কার মানুষ তাঁকে “আল-আমিন” (অর্থাৎ, বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি) উপাধি দিয়েছিল। তিনি শুধু কথায় নয়, প্রতিটি কাজে আমানতদারিতার এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন যা আজও মানবতার আদর্শ। তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে—ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়—আমানতদারিতার গভীর প্রকাশ দেখা যায়। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ তুলে ধরা হলো।

নবুওয়াতের পূর্বে আমানতের দৃষ্টান্ত: নবুওয়াত প্রাপ্তির আগেও রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সততা ও বিশ্বস্ততায় অতুলনীয়। মক্কার লোকেরা তাদের মূল্যবান সম্পদ ও সামগ্রী তাঁর কাছে নিরাপদে রাখত। এমনকি যারা তাঁর বিরোধী ছিল, তারাও জানত যে, মুহাম্মদ ﷺ কখনো কারো প্রতি খিয়ানত করবেন না।

একবার একজন কাফের ব্যবসায়ী রাসূল ﷺ-কে কিছু অর্থ আমানত হিসেবে দিয়েছিল। কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি দূরে চলে গেল এবং ফিরে এসে তার আমানত ফেরত চাইল। নবী ﷺ তা নিখুঁতভাবে ফেরত দেন। এই ঘটনায় মক্কার মানুষ তাঁর সততা ও বিশ্বস্ততার প্রতি আরও গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে।

এই দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, সত্যিকারের আমানতদার ব্যক্তি কখনো কারো সঙ্গে প্রতারণা করে না, বরং নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।

হিজরতের সময় আমানত রক্ষা: মক্কার কাফেররা যখন রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল, তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে মদীনাতে হিজরত করেন। কিন্তু তাঁর কাছে মক্কার অনেক লোকের সম্পদ ও সামগ্রী আমানত হিসেবে ছিল। তিনি নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে হলেও সেই আমানতগুলো ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

হিজরতের রাতেই তিনি তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী (রাঃ)-কে ডেকে বলেছিলেন,

“হে আলী! আমার কাছে যাদের আমানত রয়েছে, তা যেন তুমি তাদের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দাও।”

এরপর তিনি মদীনাতে হিজরত করেন।

এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, রাসূল ﷺ এমনকি নিজের শত্রুদের প্রতিও খিয়ানত করেননি। আল্লাহর রাসূলের দৃষ্টিতে আমানত এমন এক দায়িত্ব যা কোনো অবস্থাতেই লঙ্ঘনযোগ্য নয়।

রাষ্ট্রীয় জীবনে আমানতদারিতা: রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মদীনাতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি শাসক হিসেবে প্রতিটি দায়িত্বকে আমানত মনে করে পরিচালনা করেন। তিনি প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিদের নিয়োগ দিতেন, যারা সত্যবাদী, আমানতদার ও ন্যায়পরায়ণ। তিনি বলতেনঃ

“যে ব্যক্তি কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং তাতে খিয়ানত করবে, সে কিয়ামতের দিনে আল্লাহর কাছে অপমানিত অবস্থায় হাজির হবে।” (সহিহ বুখারী)

তাঁর শাসনকালে কোনো ব্যক্তিকে কেবল সম্পর্ক বা প্রভাবের কারণে পদ দেওয়া হতো না; বরং যোগ্যতা, সততা ও আমানতদারিতার ভিত্তিতেই দায়িত্ব প্রদান করা হতো। এর মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন যে, রাষ্ট্র পরিচালনায় আমানতদারিতা সমাজের ন্যায় ও শান্তির মূলভিত্তি।

শত্রুর প্রতিও আমানত রক্ষা: রাসূল ﷺ এমনকি তাঁর শত্রুদের প্রতিও আমানতের খিয়ানত করেননি। হুদাইবিয়ার চুক্তির সময় মুশরিকরা যখন মুসলমানদের প্রতি অন্যায় আচরণ করে, তখনও নবী ﷺ তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি। তিনি সর্বদা ইসলামের মর্যাদা ও প্রতিশ্রুতির সম্মান রক্ষা করেছেন।

একবার এক কাফের বন্দি মুসলমানদের সাথে পালিয়ে মদীনাতে আসে। মুসলমানরা খুশি হয়ে তাকে গ্রহণ করতে চাইল, কিন্তু নবী ﷺ বলেন—

“আমরা যার সঙ্গে চুক্তি করেছি, তাকে ফেরত না দেওয়া আমাদের জন্য খিয়ানত।”

তিনি সেই ব্যক্তিকে চুক্তির প্রতি সম্মান জানিয়ে ফেরত পাঠান। এই ঘটনায় তাঁর ন্যায়বোধ ও আমানতদারিতা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন হলো আমানতদারিতার এক পরিপূর্ণ উদাহরণ। তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণ করেছেন যে, একজন প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় তার বিশ্বাসযোগ্যতা ও দায়িত্ববোধে নিহিত। নবী ﷺ এর চরিত্র আমাদের শিক্ষা দেয়—

আমানত শুধু সম্পদ নয়, প্রতিটি দায়িত্বই একেকটি আমানত। শত্রু হোক বা বন্ধু, কারও প্রতি খিয়ানত করা ইসলামে হারাম। আমানত রক্ষাকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় এবং আখিরাতে পুরস্কৃত।

অতএব, আমাদের উচিত নবী ﷺ এর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে প্রতিটি দায়িত্বে সততা ও আমানতদারিতার পরিচয় দেওয়া। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ

“যে ব্যক্তি আমানত রক্ষা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জনে আমানতদারিতার গুরুত্ব

আমানতদারিতা ইসলামি জীবনের এক মৌলিক গুণ। “আমানত” অর্থ বিশ্বাস বা দায়িত্ব, আর “আমানতদারিতা” অর্থ সেই দায়িত্ব বা বিশ্বাস সঠিকভাবে পালন করা। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলেন —

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন যে, তোমরা আমানত তাদের কাছে পৌঁছে দাও যাদের প্রাপ্য।” (সূরা আন-নিসা, ৪:৫৮)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, আমানত রক্ষা করা ঈমানের একটি অপরিহার্য অংশ। আমানতদার ব্যক্তি আল্লাহভীরু, সৎ ও দায়িত্বশীল হয়। সে কখনো প্রতারণা, মিথ্যা বা বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয় না।

দুনিয়ার জীবনে আমানতদার ব্যক্তিই প্রকৃত অর্থে সফল। কারণ, এমন ব্যক্তি সমাজে আস্থা, সম্মান ও ভালোবাসা অর্জন করে। ব্যবসা, চাকরি, রাজনীতি বা পারিবারিক জীবনে যার মধ্যে আমানতদারিতা আছে, সে সর্বত্র শান্তি ও স্থিতি বজায় রাখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

“যার মধ্যে আমানত নেই, তার মধ্যে ঈমানও নেই।” (সহিহ হাদীস, আহমদ)

এই হাদীস প্রমাণ করে যে, আমানতদারিতা ছাড়া একজন মুসলমানের ঈমান পূর্ণ হতে পারে না।

অন্যদিকে, আখিরাতেও আমানতদারদের জন্য রয়েছে মহান প্রতিদান। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে প্রত্যেকের আমানতের হিসাব নেবেন। যারা জীবনে দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের মর্যাদা লাভ করবে। আর যারা আমানতের খিয়ানত করেছে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

সুতরাং, আমানতদারিতা এমন একটি গুণ যা দুনিয়ায় সম্মান ও শান্তি আনে, আর আখিরাতে জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করে। একজন আমানতদার মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং সমাজের আদর্শ ব্যক্তি। তাই আমাদের প্রত্যেকের উচিত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমানত রক্ষা করা, যাতে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই প্রকৃত সফলতা অর্জন করা যায়।

আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া

মানবজীবন এক গভীর রহস্যময় যাত্রা। এই যাত্রা শুরু হয় জন্মের মধ্য দিয়ে, আর শেষ হয় মৃত্যু নামক এক অনিবার্য বাস্তবতায়। কিন্তু মৃত্যুই কি শেষ? ইসলাম আমাদের শেখায় — মৃত্যুর পরেই শুরু হয় প্রকৃত ও চিরস্থায়ী জীবন, যাকে বলা হয় আখিরাত বা পরকাল। দুনিয়ার জীবন কেবল একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়, যেখানে মানুষকে পরীক্ষা করা হয় — সে আল্লাহর প্রতি কতটা অনুগত, ন্যায়পরায়ণ ও সত্যনিষ্ঠ। তাই এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায় সফলতার প্রকৃত মানদণ্ড হলো এমন জীবনযাপন করা, যা আখিরাতে চিরস্থায়ী মুক্তি ও শান্তির কারণ হবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন—

الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ:
وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

“আর নিশ্চয়ই আখিরাতই তোমার জন্য উত্তম, দুনিয়ার তুলনায়।” (সূরা আদ-দুহা: ৪)

এই আয়াতটি আমাদের হৃদয়ে স্থায়ী এক বোধ জাগিয়ে তোলে— দুনিয়া যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, এর সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। অথচ আখিরাতের জীবন চিরন্তন, যেখানে সুখ বা দুঃখ কোনো শেষ নেই। তাই একজন মুমিনের বুদ্ধিমানের পরিচয় হলো সে দুনিয়ার অল্প লাভের জন্য চিরস্থায়ী আখিরাতের ক্ষতি না করে বরং আখিরাতের সফলতাকে প্রাধান্য দেয়। মানুষ স্বভাবতই দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, সম্পদ, খ্যাতি ও আনন্দের পেছনে ছুটে চলে। কিন্তু ইসলাম এই প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বলে। কারণ, দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগ অস্থায়ী, আর আখিরাতের পুরস্কার চিরস্থায়ী। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ ۚ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ۚ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
“এই দুনিয়ার জীবন তো কেবল খেলা ও আমোদ-প্রমোদের বস্তু, আর পরকালীন আবাসই হলো প্রকৃত জীবন— যদি তারা জানত।” (সূরা আনকাবুত: ৬৪)

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, দুনিয়ার জীবন আসলে এক ক্ষণিকের খেলা; প্রকৃত ও বাস্তব জীবন হলো আখিরাত। কিন্তু দুঃখজনকভাবে অধিকাংশ

মানুষ এই সত্যটি উপলব্ধি করতে পারে না। তারা দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাতের কথা ভুলে যায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়াকে উপমা দিয়েছেন এমন এক যাত্রাপথের সাথে, যেখানে মানুষ সামান্য সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, তারপর তার প্রকৃত গন্তব্যের দিকে রওনা হয়। তিনি বলেছেন—

“দুনিয়ায় এমনভাবে থাকো যেন তুমি একজন পথিক বা অতিক্রমকারী।” (সহিহ বুখারি)

এই হাদিসে নবী ﷺ মানুষকে দুনিয়ার অস্থায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন একজন যাত্রী সামান্য বিশ্রামের পর আবার তার যাত্রা অব্যাহত রাখে, তেমনি আমরাও মৃত্যুর পর এমন এক জীবনে প্রবেশ করব, যার শেষ নেই। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো সেই চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি নেওয়া, কারণ আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত সাফল্য।

দুনিয়ার জীবন আমাদের জন্য পরীক্ষা। কেউ ধন-সম্পদ, কেউ দারিদ্র্য, কেউ ক্ষমতা, কেউ দুর্বলতার মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়। এই পরীক্ষার সফলতা নির্ভর করে আমরা কতটা আল্লাহর বিধান মেনে চলি, তাঁর স্মরণে থাকি, ও গুনাহ থেকে বিরত থাকি তার উপর। তাই দুনিয়ার প্রতিটি কাজের মধ্যেই থাকা উচিত আখিরাতের চিন্তা। যেমন: ব্যবসায় সততা বজায় রাখা, ইবাদত ঠিকভাবে পালন করা, মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা— এগুলো সবই আখিরাতমুখী জীবনযাপনের অংশ।

যে ব্যক্তি দুনিয়ার সামান্য আরামকে আখিরাতের সফলতার চেয়ে বড় মনে করে, সে প্রকৃতপক্ষে নিজের ক্ষতি ডেকে আনে। দুনিয়ার স্বপ্নমেয়াদি সুখের জন্য আখিরাতের অনন্ত সুখ বিসর্জন দেওয়ার চেয়ে বড় বোকামি আর কিছু হতে পারে না। কারণ দুনিয়ার জীবন মুহূর্তের, কিন্তু আখিরাতের জীবন অনন্ত।

অতএব, এই পৃথিবীতে আমাদের অবস্থান এক ক্ষণস্থায়ী সফরের মতো। আমাদের প্রকৃত গন্তব্য হলো আখিরাত। এখানে আমরা যা করি— প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ, প্রতিটি আচরণ— সবকিছুর হিসাব দিতে হবে সেদিন। এই আয়াত আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে, কোনো কাজই আখিরাতে অগণ্য থাকবে না। তাই জীবনকে এমনভাবে পরিচালনা করা উচিত, যাতে দুনিয়ায় আমাদের প্রতিটি কাজ আখিরাতের সফলতার সোপান হয়ে দাঁড়ায়।

আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া মানে হলো — জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতলাভকে লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা। একজন প্রকৃত মুমিন দুনিয়ার কাজও আখিরাতের উদ্দেশ্যে করে, কারণ সে জানে দুনিয়া সাময়িক কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী। আর যারা আখিরাতকে প্রাধান্য দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়াও বরকতময় করে দেন।

আখিরাতের বাস্তবতা ও গুরুত্ব

আখিরাত ইসলামি বিশ্বাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি এমন এক চিরস্থায়ী জীবনের নাম, যেখানে মানুষ দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কাজের হিসাব দেবে। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী ও পরীক্ষার জায়গা, কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী প্রতিদানের স্থান। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য—কে সৎপথে চলে আর কে ভুল পথে যায় তা যাচাই করতে। এই পরীক্ষার ফল ঘোষণা হবে আখিরাতে, যেখানে কেউ জান্নাতে পুরস্কৃত হবে আর কেউ জাহান্নামে শাস্তি পাবে। সুতরাং আখিরাতের বিশ্বাস মানুষের জীবনবোধ, চিন্তা ও আচরণে গভীর প্রভাব ফেলে।

আখিরাতের বাস্তবতা এমন এক সত্য, যা অস্বীকার করা মানে নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্যকেই অস্বীকার করা। মানুষ যখন মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে ভাবে, তখন তার অন্তরে ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দুনিয়ায় অনেক সময় দেখা যায়, অন্যায়কারীরা পার্থিব শাস্তি থেকে বেঁচে যায়, কিন্তু আখিরাতে কেউই আল্লাহর বিচার থেকে রেহাই পাবে না। আল্লাহর এই ন্যায়বিচারের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটবে আখিরাতে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সতর্ক করে বলেছেন, “যে একমাত্র আল্লাহর সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে” — এই আয়াত মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে দুনিয়ার প্রতিটি কাজের জন্য একদিন জবাবদিহি করতে হবে।

আখিরাতের গুরুত্ব উপলব্ধি করলে মানুষ তার জীবনকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। সে জানে যে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, সম্পদ ও ক্ষমতা সাময়িক, কিন্তু আখিরাতের সুখ-শান্তি অনন্ত। এই বিশ্বাস মানুষকে সৎ পথে চলতে, অন্যের অধিকার রক্ষা করতে এবং পাপ থেকে দূরে থাকতে উৎসাহ দেয়। একজন মু’মিনের জন্য আখিরাতের চিন্তা তাকে নম্র, ধৈর্যশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলে। সে জানে, কোনো ভালো কাজই বৃথা যায় না এবং কোনো অন্যায়ই অদণ্ডিত থাকে না। তাই আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ করে এবং সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করে।

অতএব, আখিরাতের বাস্তবতা কেবল ধর্মীয় ধারণা নয়, এটি মানুষের আত্মিক ও নৈতিক জীবনের ভিত্তি। দুনিয়ার প্রতিটি কাজের ফল যদি একদিন পাওয়া যায়—এই বিশ্বাসই মানুষকে সঠিকভাবে বাঁচতে শেখায়। যে ব্যক্তি আখিরাতকে স্মরণ করে, সে অন্যায় করতে ভয় পায়, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালায়। আখিরাতের এই দৃঢ় বিশ্বাসই মানুষকে প্রকৃত অর্থে সফল করে, কারণ প্রকৃত সফলতা দুনিয়ায় নয়, বরং সেই চিরস্থায়ী জীবনে যেখানে আল্লাহর রহমতে জান্নাতের সুখ ও শান্তি অপেক্ষা করছে।

আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা প্রতিশ্রুতি

আখিরাত বা পরকাল ইসলামী আকিদার একটি মৌলিক অংশ। আল্লাহ তায়ালা কুরআনের বহু স্থানে আখিরাতের অস্তিত্ব, বিচার দিবস এবং এর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আখিরাত এমন একটি বাস্তবতা, যেখানে প্রতিটি মানুষ তার দুনিয়ার আমলের ফল ভোগ করবে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ইরশাদ করেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿١٠٠﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿١٠١﴾

দেখতে পাবে, আর যে পরিমাণ পরমাণু পরিমাণও মন্দ কাজ করেছে, সে তাও দেখতে পাবে।” (সূরা যিলযাল: ৭-৮)

এই আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়, আল্লাহ তায়ালা মানুষের কোনো আমলই বৃথা যেতে দেন না। দুনিয়ায় করা প্রতিটি ভালো ও খারাপ কাজের জন্য আখিরাতে ন্যায্যবিচার হবে — এটি আল্লাহর এক অটল প্রতিশ্রুতি।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি রহমতশীল। তাই তিনি আখিরাতে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। জান্নাত এমন এক চিরস্থায়ী সুখের আবাস যেখানে কোনো দুঃখ, কষ্ট বা মৃত্যু নেই। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلِيلٌ

“নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, আমি তাদের এমন বাগিচায় প্রবেশ করাবো, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। তাদের জন্য থাকবে পবিত্র সঙ্গিনী, এবং আমি তাদের গভীর ছায়ায় প্রবেশ করাবো।” (সূরা নিসা: ৫৭)

এ আয়াতটি জান্নাতের অনন্ত সুখের সুসংবাদ বহন করে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়া করে তাঁদের নেক আমলের বিনিময়ে এমন পুরস্কারের অঙ্গীকার করেছেন, যা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যায়। জান্নাতবাসীরা সেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সান্নিধ্য লাভ করবে, যা সব সুখের চূড়ান্ত রূপ।

অন্যদিকে, যারা অবিশ্বাস, পাপাচার ও অন্যায়ের পথে চলেছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁদের জন্য জাহান্নামের শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুরআনে বলা হয়েছে,

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

“আর যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য রয়েছে সংকীর্ণ জীবন; আর পুনরুত্থানের দিনে আমি তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাবো।” (সূরা জাহা, আয়াত ১২৪)

এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, দুনিয়ায় আল্লাহকে ভুলে থাকা মানুষ আখিরাতে কঠিন পরিণতির মুখোমুখি হবে। আল্লাহর ন্যায্যবিচারের নিয়মে কেউ অন্যায়ের শিকার হবে না, প্রত্যেকে তার প্রাপ্য অনুযায়ী ফল পাবে।

আখিরাতের প্রতিশ্রুতি মানুষকে দায়িত্বশীল জীবনের দিকে আহ্বান জানায়। এটি মানুষকে মনে করিয়ে দেয় যে দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখিরাত অনন্ত। যে আল্লাহর আদেশ মেনে চলে, সে জান্নাতের যোগ্য হবে, আর যে তাঁর বিরোধিতা করে, সে চিরস্থায়ী শাস্তিতে পতিত হবে। তাই একজন মুমিন সর্বদা আখিরাতের প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে জীবনযাপন করে, নেক আমল বাড়ায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ তায়ালার এই প্রতিশ্রুতি প্রতিটি মানুষের জন্য সতর্কবার্তা ও আশার বার্তা— যাতে তারা দুনিয়ার মোহ ত্যাগ করে আখিরাতের চিরস্থায়ী মুক্তির পথে অগ্রসর হয়।

আখিরাত সম্পর্কে রাসূল (সা.) এর শিক্ষা

আখিরাত ইসলামি বিশ্বাসের একটি মৌলিক ও অপরিহার্য অংশ। আল্লাহ তায়ালার যেমন কুরআনে আখিরাতের কথা বারবার স্মরণ করিয়েছেন, তেমনি নবী করিম ﷺ তাঁর জীবন ও বাণীর মাধ্যমে মানুষকে আখিরাতের প্রতি সচেতন করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়েছেন যে এই পৃথিবী স্থায়ী নয়—এটি একটি ক্ষণস্থায়ী পরীক্ষার ময়দান, যেখানে মানুষকে তার কর্মের মাধ্যমে আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, প্রকৃত জীবন শুরু হবে মৃত্যুর পর। তাই দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি কাজ এমনভাবে করতে হবে, যেন তা আখিরাতের মুক্তি ও জান্নাতের কারণ হয়।

রাসূল (সা.) মানুষকে বুঝিয়েছেন, এই দুনিয়ার সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আসলে এক ধরনের পরীক্ষা। এখানে মানুষ ধৈর্য, ন্যায়পরায়ণতা, সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির মাধ্যমে সফলতা অর্জন করতে পারে। তিনি শিখিয়েছেন—যে ব্যক্তি দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে পড়ে, সে আসলে নিজের আখিরাতকে বিনষ্ট করে ফেলে। তাঁর শিক্ষায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, দুনিয়ার জীবন হলো এক অস্থায়ী সফর, যার শেষ গন্তব্য হলো আখিরাত। তাই একজন মুমিনের উচিত নিজের প্রতিটি কাজের হিসাব রাখা এবং চিন্তা করা—এ কাজের ফলাফল আখিরাতে কেমন হবে?

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর অনুসারীদের মাঝে আখিরাতের ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে বাস্তব জীবনেও এর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন, কখনও বিলাসিতা বা অহংকারে জড়াননি। তিনি নিজের জীবন দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন যে, প্রকৃত সফলতা ধনসম্পদ বা পদমর্যাদায় নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের মুক্তিতেই নিহিত। নবী করিম (সা.) প্রতিটি মানুষকে নিজ নিজ কাজের প্রতি দায়িত্বশীল হতে বলেছেন। কারণ আখিরাতে প্রত্যেককে নিজের কর্মের হিসাব দিতে হবে, কেউ কারও দায়ভার বহন করবে না।

তিনি আরো শিক্ষা দিয়েছেন যে, মানুষকে আখিরাতের চিন্তা মনে রেখে দুনিয়ার কাজ করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে কাজ করা, অন্যের প্রতি সুবিচার করা, সততা বজায়

রাখা—সবই আখিরাতের প্রস্তুতির অংশ। রাসূল (সা.) মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজের বিনিময় আখিরাতে দেবেন—সৎকর্মের পুরস্কার জান্নাত, আর অন্যায়ের প্রতিফল জাহান্নাম। তাই একজন সত্যিকারের মুসলমান সবসময় সচেতন থাকে যেন তার কোনো কাজ আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ না হয়।

আখিরাতের বিষয়ে নবী করিম ﷺ মানুষকে ভয় ও আশা—এই দুই অনুভূতির মধ্যে রাখার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে ভয় দেখিয়েছেন আখিরাতের কঠিন বিচার ও শাস্তির কথা বলে, আবার একইসঙ্গে আল্লাহর রহমতের আশায় রাখার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—মানুষ যেন গুনাহ থেকে দূরে থাকে, কিন্তু হতাশও না হয়। আল্লাহর প্রতি আশা ও ভয়—এই দুই শক্তিই মানুষকে সৎপথে রাখে।

রাসূল (সা.) বলেছেন যে, আখিরাতের স্মরণ মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং অন্তরকে নরম করে। তিনি মানুষকে মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করতে বলেছেন, যাতে তারা দুনিয়ার মোহ থেকে দূরে থাকে। তাঁর এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে বাস্তবতার মুখোমুখি করা—একদিন এই জীবন শেষ হবে, এবং সেই দিনের জন্যই মানুষকে প্রস্তুতি নিতে হবে।

তিনি আরও শিক্ষা দিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিনে প্রতিটি ছোট-বড় আমলের হিসাব নেবেন। তিনি বলেছেন,

“কিয়ামতের দিনে মানুষ চারটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত তার পা সরবে না — জীবনের সময় কিভাবে কাটিয়েছে, জ্ঞানকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছে, সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে, আর শরীরকে কিসে ক্ষয় করেছে।” (তিরমিযি, হাদিস:

২৪১৭)

রাসূল ﷺ এর শিক্ষা ছিল — দুনিয়াকে আখিরাতের ফসলের ক্ষেত হিসেবে দেখা। তিনি মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, এই পৃথিবী আসল বাড়ি নয়, বরং আখিরাতের প্রস্তুতির স্থান।

আখিরাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা মানবজীবনের দিকনির্দেশনা। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন, আখিরাতের চিন্তা ছাড়া দুনিয়ার জীবন অন্ধকারময়। এই চিন্তা মানুষকে ন্যায্যের পথে রাখে, অন্যায় থেকে বিরত রাখে এবং জীবনে আল্লাহভীতি জাগ্রত করে। তাই মুসলমানের উচিত রাসূল (সা.)-এর শিক্ষা অনুসরণ করে এমন জীবন গঠন করা, যা আখিরাতের মুক্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ হয়।

অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আসল জীবন দুনিয়ায় নয়, বরং আখিরাতে। এখানে আমরা পরীক্ষা দিচ্ছি, আর আখিরাতেই তার ফলাফল পাওয়া যাবে।

তাই প্রতিটি মুহূর্তে আখিরাতে প্রস্তুতি গ্রহণ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করা এবং রাসূল (সা.)-এর পথ অনুসরণ করাই আমাদের একমাত্র মুক্তির পথ।

কুফর ও শিরক

কুফরের অর্থ: “কুফর” (كُفْر) শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ “কাফারা” (كَفَرَ) থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ হলো ঢেকে ফেলা, গোপন করা বা অস্বীকার করা।

অর্থাৎ, কুফর বলতে বোঝায়—আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করা, তাঁর দেওয়া সত্য, নির্দেশনা ও নেয়ামতকে অস্বীকার করা, কিংবা ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করা। যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল ﷺ, কুরআন বা আখিরাতকে অস্বীকার করে, সে কুফরিতে লিপ্ত। কুফর মূলত ইসলামের বাইরে চলে যাওয়া বা ইসলামকে অস্বীকার করার নাম।

ইসলামী পরিভাষায় কুফর হলো—

“আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দ্বারা প্রেরিত এমন কোনো বিষয়কে অস্বীকার করা, যা ইসলামে অপরিহার্যভাবে সত্য বলে প্রমাণিত।”

অর্থাৎ, কোরআন-হাদীসের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা অস্বীকার করা বা তার বিরোধিতা করাই কুফর।

শিরকের অর্থ: “শিরক” (شِرْك) শব্দটি এসেছে আরবি “শারাকা” (شَرَكَ) ধাতু থেকে, যার অর্থ “অংশীদার করা বা মিলিত করা”।

অর্থাৎ, শিরক হলো আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে অন্য কাউকে কোনো বিষয়ে অংশীদার মনে করা—ইবাদতে, সৃষ্টিতে, ক্ষমতায় বা জ্ঞানে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে দোয়া চাওয়া, মানত দেওয়া, ভরসা করা বা তাঁকে সৃষ্টিকর্তা বা রিজিকদাতা হিসেবে মনে করাই শিরক।

ইসলামী পরিভাষায় শিরক হলো—

“আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে ইবাদত, প্রভুত্ব, বা গুণাবলির ক্ষেত্রে অন্য কাউকে শরিক করা।”

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউও ক্ষমতাপ্রাপ্ত, দোয়া কবুল করতে পারে বা ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে—সে শিরক করেছে।

কুফর ও শিরক দুটোই ইসলামের সবচেয়ে বড় অপরাধ। উভয়ই মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে এবং আখিরাতে চিরস্থায়ী শাস্তির কারণ হয়।

কিন্তু তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো—কুফর হলো অস্বীকার, আর শিরক হলো অংশীদার করা।

অর্থাৎ, কুফর হলো “না মানা”, আর শিরক হলো “ভুলভাবে মানা”।

কুফর ও শিরকের মূল কারণ বিস্তারিত

মানুষকে আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য। আল্লাহর একত্ব বিশ্বাস রাখা (তাওহিদ) মানবজীবনের মূল ভিত্তি। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহর একত্ব অস্বীকার করে (কুফর) বা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করে (শিরক), তখনই সে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়। কুফর ও শিরকের কারণ শুধু অজ্ঞতা নয়; বরং এর পেছনে রয়েছে মানসিক, সামাজিক, ও নৈতিক দুর্বলতা। নিচে এই কারণগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হলো।

১. অহংকার ও আত্মসন্ত্রিস্তা: কুফর ও শিরকের সবচেয়ে বড় কারণ হলো অহংকার। অহংকারী মানুষ সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না, কারণ তা তার নিজের মান-অহংকারে আঘাত করে।

আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার প্রথম উদাহরণই হলো ইবলিসের অহংকার। সে আল্লাহর আদেশে আদম (আঃ)-কে সেজদা করতে অস্বীকার করেছিল, কারণ সে নিজেকে উত্তম মনে করেছিল। অহংকার মানুষকে সত্য থেকে দূরে ঠেলে দেয়, ফলে সে আল্লাহর আদেশ ও নবীদের বাণী অস্বীকার করে কুফরে লিপ্ত হয়।

২. অজ্ঞতা ও অজ্ঞতার প্রতি উদাসীনতা: অনেকে কুফর ও শিরকে পড়ে যায় শুধু অজ্ঞতার কারণে। তারা আল্লাহর একত্ব, নবীদের দাওয়াত বা ইসলামের সঠিক শিক্ষা জানে না। কিন্তু এর চেয়েও ভয়াবহ হলো—জানার চেষ্টা না করা।

যে ব্যক্তি জ্ঞানের আলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে অজান্তেই শিরক বা কুফরে পড়ে যায়। যেমন, কেউ তাবিজ, জ্যোতিষ বা কবরপূজাকে ধর্মীয় কাজ মনে করে—এটি মূলত অজ্ঞতার ফল।

৩. দুনিয়ার মোহ ও স্বার্থপরতা: দুনিয়ার লোভ, সম্পদ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অনেকে সত্য জানে, তবুও দুনিয়ার স্বার্থে তা অস্বীকার করে। ফেরাউন জানত যে মুসা (আঃ) আল্লাহর রসূল, কিন্তু নিজের রাজত্ব ও গৌরব হারানোর ভয়ে সে কুফরিতে লিপ্ত হয়। আজও অনেক মানুষ দুনিয়ার মর্যাদা ও অর্থের জন্য সত্যকে উপেক্ষা করে।

৪. পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ: অনেক মানুষ সত্য জানার পরও বলে—“আমরা তো আমাদের বাপ-দাদার পথ অনুসরণ করি।”

এই অন্ধ অনুকরণ কুফর ও শিরকের অন্যতম কারণ। অনেক জাতি তাদের পূর্বপুরুষের তৈরি মিথ্যা দেবতা, প্রথা ও রীতিনীতিকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহর একত্ব অস্বীকার করেছে। ইসলাম মানুষকে যুক্তি ও জ্ঞানের ভিত্তিতে সত্য অনুসন্ধানের শিক্ষা দেয়, অন্ধ অনুসরণের নয়।

৫. শয়তানের প্ররোচনা:শয়তানের প্রধান লক্ষ্যই হলো মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত রাখা। সে নানা কৌশলে মানুষকে শিরক ও কুফরে লিপ্ত করে। কখনো সে মানুষকে বিভ্রান্ত করে মিথ্যা বিশ্বাসে, কখনো গর্ব ও মোহে ডুবিয়ে রাখে।

শয়তান মানুষকে বলে—“আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, একটু শিরক করলে কী হবে?” এভাবে সে ধীরে ধীরে মানুষকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ঠেলে দেয়।

৬. অজ্ঞাত ভয় ও কুসংস্কার:মানুষ স্বভাবতই ভীতু—অজানা ভয়, অমঙ্গলের আশঙ্কা থেকে অনেক সময় ভুল পথে যায়। অতীতে মানুষ বজ্রপাত, ঝড়, রোগ বা মৃত্যুকে দেবতার ক্রোধ মনে করে তাদের পূজা করত।

এই কুসংস্কার ও ভীতিবোধ থেকেই শিরক জন্ম নেয়। এখনো অনেক সমাজে তাবিজ-কবচ, ভাগ্য গণনা, জ্যোতিষ, পীর-পূজা ইত্যাদি তার আধুনিক রূপ।

৭. জ্ঞানীদের ভ্রান্ত মতবাদ ও বিভ্রান্তিকর শিক্ষা:কখনো কখনো কুফর ও শিরক ছড়ায় তথাকথিত “বুদ্ধিজীবী” ও “ধর্মগুরু”দের মাধ্যমে। তারা আল্লাহর বাণী বিকৃত করে নিজেদের মতবাদ প্রচার করে। কেউ বলে, “সব ধর্মই সমান,” কেউ বলে, “আল্লাহর প্রয়োজন নেই, মানুষই সর্বশক্তিমান।”

এভাবে মানুষকে তারা বিভ্রান্ত করে এবং ধীরে ধীরে ঈমানের শিকড় নষ্ট করে দেয়।

৮. দুনিয়ার মোহ ও আত্মতুষ্টি:কিছু মানুষ মনে করে, সে যা করছে সেটিই ঠিক। তার জীবনে সুখ-সুবিধা থাকলেই মনে করে আল্লাহ সন্তুষ্ট আছেন। এই আত্মতুষ্টি তাকে তাওহিদ থেকে দূরে নিয়ে যায়। ফলে সে শিরক বা কুফরে লিপ্ত হয় অথচ নিজেকে ধার্মিক মনে করে।

৯. দুর্বল ঈমান ও আত্মশুদ্ধির অভাব:যে হৃদয়ে আল্লাহভীতি নেই, সেখানে সহজেই কুফর ও শিরকের বীজ জন্মায়। ঈমান দুর্বল হলে মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভের জন্য আখিরাত ভুলে যায়। আত্মশুদ্ধি না করলে সে ধীরে ধীরে ঈমান হারায়, এবং শিরক বা কুফরের পথে চলে যায়।

১০. আল্লাহর প্রতি অকৃতজ্ঞতা:কুফর ও শিরকের অন্যতম কারণ হলো নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা। যখন মানুষ আল্লাহর দানকে নিজের যোগ্যতা মনে করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তখন সে অহংকারী হয় এবং অবশেষে কুফরে লিপ্ত হয়।

অন্যদিকে, কেউ যদি মনে করে অন্য ব্যক্তি বা দেবতা তার রিজিক বা উপকারের উৎস, তবে সে শিরকে পতিত হয়।

কুফর ও শিরক কোনো আকস্মিক অপরাধ নয়; বরং এটি মানুষের অন্তরের দুর্বলতা, অজ্ঞতা ও অহংকারের ফল। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এই মানসিক ও বিশ্বাসগত অন্ধকার থেকে মুক্ত করা এবং তাওহিদের আলোয় পথ দেখানো।

তাই প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য হলো—নিজেকে আত্মতুষ্টি, অহংকার, অজ্ঞতা ও শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচিয়ে ঈমানকে দৃঢ় রাখা এবং আল্লাহর একত্বে অটল থাকা।
আল্লাহ তায়াল্লা আমাদের সবাইকে কুফর ও শিরকের সমস্ত কারণ থেকে নিরাপদ রাখুন।
আমিন।

কুফর ও শিরকের ধরন

ইসলাম তাওহিদের ধর্ম — একমাত্র আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রাখার শিক্ষা দেয়। কিন্তু যখন মানুষ আল্লাহর এই একত্বকে অস্বীকার করে (কুফর) বা তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার মনে করে (শিরক), তখনই সে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়। কুফরি ও শিরক উভয়েরই বিভিন্ন ধরন রয়েছে, যেগুলো কখনো সরাসরি, কখনো সূক্ষ্মভাবে মানুষের বিশ্বাস ও আচরণে প্রবেশ করে। নিচে উভয়ের ধরনসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

ইসলামী শরীয়তের আলোকে “কুফর” মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত — বড় কুফর (কুফর আকবার), ছোট কুফর (কুফর আসগর)

১. বড় কুফর (الكفر الأكبر): এটি এমন কুফর যা মানুষকে ইসলামের পরিধি থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয়। অর্থাৎ, এ ধরনের কুফর করলে কেউ আর মুসলমান থাকে না যতক্ষণ না সে তাওবা করে। বড় কুফর কয়েকটি ভাগে বিভক্ত —

ক. কুফর ইনকার (অস্বীকারের কুফর): যে ব্যক্তি আল্লাহ, রাসূল ﷺ, কুরআন, আখিরাত বা ইসলামের কোনো মৌলিক বিষয়কে অস্বীকার করে, সে কুফর ইনকারে লিপ্ত। যেমন—
কেউ যদি বলে, “নামাজ বা রোজা দরকার নেই,” বা “আখিরাত বলে কিছু নেই,” তবে সে কুফর করছে।

খ. কুফর জুহুদ (অসত্য বলে দাবি করা বা অগ্রাহ্য করা): যে ব্যক্তি অন্তরে সত্য জানে, কিন্তু অহংকার বা স্বার্থে তা অস্বীকার করে। যেমন ফেরাউন মুসা (আঃ)-এর সত্যতা জানত, তবুও অস্বীকার করেছিল রাজত্ব হারানোর ভয়ে।

গ. কুফর ই'রাদ (উদাসীনতা বা বিমুখতার কুফর): যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ ও ধর্মীয় বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—জানতেও চায় না, মানতেও চায় না। যেমন অনেকেই বলে, “ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাই না।” এটি কুফর ই'রাদ।

ঘ. কুফর নিফাক (ভণ্ডামির কুফর): এটি হলো মুনাফিকদের কুফর। মুখে মুসলমান বলে, কিন্তু অন্তরে ইসলামকে অস্বীকার করে। তারা বাহ্যিকভাবে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, কিন্তু মনে বিশ্বাস রাখে না।

ঙ. কুফর ইস্তিহযা (ঠাট্টা-বিদ্রূপের কুফর):যে ব্যক্তি আল্লাহ, কুরআন, রাসূল ﷺ বা ইসলামী বিধান নিয়ে উপহাস করে, সে কুফরি ইস্তিহযায় লিপ্ত। ইসলামকে উপহাস করা কুফরের অন্যতম ভয়াবহ রূপ।

চ. কুফর কিবর (অহংকারের কুফর):সত্য জানার পরও অহংকারের কারণে তা অস্বীকার করা। ইবলিসের কুফর ছিল অহংকারজনিত।

২. ছোট কুফর (الكفر الأصغر):ছোট কুফর এমন কিছু কাজ বা আচরণ যা কুফরির মতো হলেও মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে না। তবে এটি বড় গুনাহ এবং ঈমানকে দুর্বল করে।এর উদাহরণ—

আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করা।ইসলামী ভাইকে “কাফের” বলে অপমান করা (যদি তা মিথ্যা হয়)।দুনিয়ার কারণে আল্লাহর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা।

এই ধরনের কুফর মানুষের ঈমান নষ্ট না করলেও, আত্মিকভাবে ধ্বংস করে এবং আখিরাতে কঠোর জবাবদিহির কারণ হয়।

শিরকের ধরন (ধরনসমূহ):শিরকও মূলত দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত — বড় শিরক (শিরক আকবার), ছোট শিরক (শিরক আসগর)

১. বড় শিরক (الشرك الأكبر):এটি হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি অংশীদার করা, যা মানুষকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বহিষ্কার করে। বড় শিরক চারটি ভাগে বিভক্ত

ক. শিরক ফি রুবুবিয়াহ (প্রভুত্বে শরিক করা):বিশ্বাস করা যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টির কাজ করে, রিজিক দেয়, ভাগ্য নির্ধারণ করে বা মৃত্যুর ক্ষমতা রাখে। যেমন—কেউ বলে, “ফলানা পীর আমার সন্তান দিয়েছে” বা “ফলানা দেবতা বৃষ্টি দেয়”—এটি শিরক ফি রুবুবিয়াহ।

খ. শিরক ফি উলুহিয়াহ (ইবাদতে শরিক করা):আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে ইবাদত করা। যেমন—কবর, পীর, সাধু বা দেবতার উদ্দেশ্যে দোয়া করা, মানত দেওয়া, কোরবানি করা বা তাদের থেকে সাহায্য চাওয়া।

গ. শিরক ফি আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণে শরিক করা):আল্লাহর নাম ও গুণ অন্যের সঙ্গে যুক্ত করা বা কারো জন্য আল্লাহর গুণ ব্যবহার করা। যেমন—“ফলানা মানুষ সব জানে,” “সে জীবন দিতে পারে,” ইত্যাদি।

ঘ. শিরক ফি তাহাক্কুম (শাসনে বা বিধানে শরিক করা):যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহর আইন ছাড়াও মানুষের বানানো আইন আল্লাহর সমান বা উত্তম—সে শিরক ফি তাহাক্কুমে লিপ্ত।

২. ছোট শিরক (الشرك الأصغر): ছোট শিরক এমন কাজ বা মনোভাব যা আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি অংশীদার না করলেও তাওহিদের পরিপন্থী। এটি বড় শিরকের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এর কিছু উদাহরণ হলো—

নামাজ বা দান-খয়রাত মানুষকে দেখানোর জন্য করা (রিয়া)। মুখে এমন কথা বলা, যা আল্লাহর একত্বের পরিপন্থী, যেমন—“আমার সৌভাগ্যই আমাকে রক্ষা করেছে।” তাবিজ-কবচে অন্ধ বিশ্বাস রাখা। শপথ করা অন্য কারো নামে (যেমন—“আমি পীরের নামে শপথ করছি”)। রাসূল ﷺ বলেছেন—

“আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে ভয় করি ছোট শিরককে।”

সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন—“ছোট শিরক কী?”

তিনি বললেন—“রিয়া (লোকদেখানো)।”

শিরকের সূক্ষ্ম রূপ (গোপন শিরক): এটি এমন শিরক যা অন্তরে লুকানো থাকে, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। যেমন—কাজ করার সময় মানুষ কী বলবে, তা নিয়ে চিন্তা করা। প্রশংসা পাওয়ার আশায় সৎকর্ম করা। কোনো ব্যক্তিকে বা বস্তুকে অতিরিক্ত সম্মান করা এমনভাবে যেন সে অদৃশ্যভাবে উপকার বা ক্ষতি করতে পারে।

কুফর ও শিরক উভয়ই ইসলামের ভিত্তি ধ্বংস করে। কুফর হলো আল্লাহর সত্য অস্বীকার করা, আর শিরক হলো আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার করা।

উভয়েরই বড় ও ছোট রূপ আছে—বড়টি মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়, ছোটটি ঈমান দুর্বল করে দেয়। তাই একজন মুসলমানের উচিত—নিজের বিশ্বাস, কথা ও কাজ সবসময় তাওহিদের আলোকে যাচাই করা এবং কুফর-শিরকের সব রূপ থেকে দূরে থাকা।

সমাজে কুফর ও শিরকের প্রকাশ

আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য এবং তাওহিদের আলোয় জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যুগে যুগে মানুষ আল্লাহর একত্ব থেকে বিচ্যুত হয়ে কুফর ও শিরকে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমান সমাজেও এসব বিভ্রান্তি নানা রূপে বিদ্যমান। কুফরি ও শিরক শুধু মূর্তি বা দেবতা পূজায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং চিন্তা, আচরণ, সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থার ভেতরেও এটি ছড়িয়ে পড়েছে। নিচে আধুনিক সমাজে কুফর ও শিরকের কিছু প্রধান প্রকাশ তুলে ধরা হলো।

১. বিশ্বাসে কুফর ও শিরকের প্রকাশ: বর্তমান যুগে অনেকেই আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে বা একেবারেই অস্বীকার করে—এটি হলো বিশ্বাসের কুফর। কেউ বলে, “বিজ্ঞানই সবকিছু ব্যাখ্যা করতে পারে, ঈশ্বরের প্রয়োজন নেই।” আবার কেউ বিশ্বাস করে, “সব ধর্মই একই”—এটি হলো তাওহিদের বিকৃতি, যা শিরকের সূক্ষ্ম রূপ।

এছাড়া কিছু মানুষ মনে করে, ভাগ্য নির্ধারণ করে তারা নিজেরা বা তারকা-গ্রহ—এটিও বিশ্বাসগত শিরক।

২. ইবাদতে শিরকের প্রকাশ: ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। কিন্তু সমাজে দেখা যায়—অনেকে কবর, মাজার বা পীরের কাছে মানত দেয়, সাহায্য চায়, মাথা নত করে। কেউ আবার বলে, “পীর সাহেবের দোয়া ছাড়া আমার কাজ হয় না।”

এই ধরনের কাজ ইবাদতে শিরকের প্রকাশ। কেউ কেউ আল্লাহর কাছে না চেয়ে অন্যের কাছে দোয়া প্রার্থনা করে, যা সরাসরি তাওহীদের বিপরীত।

৩. দুনিয়াবাদ ও বস্তুবাদে কুফর: আজকের মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুনিয়াবাদী চিন্তায় নিমগ্ন। তারা মনে করে—“অর্থই সবকিছু”, “মানুষই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা।” এই ধারণা আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেয় এবং মানুষকে কুফরের পথে ঠেলে দেয়।

কেউ কর্মফল বা ‘নিয়তি’ বলে যা মানে, সেটি আসলে আল্লাহর ইচ্ছা অস্বীকারের এক প্রকার সূক্ষ্ম কুফর।

৪. আইন ও বিচারব্যবস্থায় শিরক: যখন কোনো সমাজ আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করে মানুষের বানানো আইনকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তখন সেখানে শিরক প্রবেশ করে। কারণ ইসলাম বলে—শাসন ও বিধান কেবল আল্লাহরই অধিকার।

কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনেকেই মনে করে—“মানুষের তৈরি সংবিধানই সর্বোত্তম,” যা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে শরিক করা। এটি শিরক ফি তাহাক্কুম (শাসনে শরিক করা)।

৫. সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানে শিরক: অনেক সমাজে এমন সাংস্কৃতিক প্রথা দেখা যায়, যা শিরক ও কুফরির ভিত্তিতে দাঁড়ানো। যেমন—নববর্ষ, জন্মদিন বা কোনো উৎসবে “ভাগ্য দেবতার” পূজা করা। কুসংস্কারের নামে “অমঙ্গল দূর” করতে পশু উৎসর্গ করা। বাড়িতে নতুন কিছু আনলে আগুন, পানি বা ধূপ দেখানো। এগুলো সবই এমন প্রথা, যা আল্লাহর একত্বের পরিপন্থী।

৬. জ্যোতিষ, তাবিজ ও কুসংস্কারে শিরক: বর্তমান সমাজে অনেক মানুষ জ্যোতিষ, ভাগ্যগণনা, রাশিফল, তাবিজ-কবচ ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস রাখে। কেউ ভাবে, “তাবিজ ছাড়া আমি নিরাপদ নই,” আবার কেউ বলে, “রাশিফল আমার জীবনের ভবিষ্যৎ বলে দেয়।”

এগুলো মূলত শিরকের আধুনিক রূপ। ইসলাম শেখায়—ভবিষ্যৎ জানেন কেবল আল্লাহ, কোনো মানুষ বা বস্তু নয়।

৭. অন্যায় নেতৃত্ব ও উপাস্যরূপে মানুষকে মানা: যখন কোনো ব্যক্তি বা নেতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে মানুষ তাকে ভুল হলেও সমর্থন দেয়, অন্ধভাবে অনুসরণ করে, তার আদেশকে আল্লাহর আদেশের উপরে স্থান দেয়—তখন এটি মানুষকে উপাস্য বানানো, অর্থাৎ শিরক।

ইতিহাসে অনেক রাজা, নেতা ও পীর নিজেদের দেবতার মতো মর্যাদা দিয়েছে, যা সমাজে শিরকের প্রকট রূপ।

৮. প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের অপব্যবহারে কুফর:বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আল্লাহর নিয়ামত, কিন্তু যখন মানুষ এটিকে আল্লাহর বিকল্প মনে করে, তখন কুফর জন্ম নেয়। কেউ মনে করে, “বিজ্ঞানই সৃষ্টিকর্তা,” কেউ আবার বিশ্বাস করে, “মানুষ একদিন অমর হবে।”

এগুলো আল্লাহর সৃষ্টিশক্তিকে অস্বীকার করার শামিল, যা কুফরের আধুনিক রূপ।

৯. ধর্মে উদাসীনতা ও নির্লিপ্ততা:অনেকেই এখন বলে—“ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, জীবনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই।”

এই মনোভাব আসলে এক ধরনের কুফর ই‘রাদ (উদাসীন কুফর)। কারণ ইসলাম কেবল নামাজ বা রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়। ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া মানেই আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা।

১০. অকৃতজ্ঞতা ও নিয়ামত অস্বীকারে কুফর:আল্লাহ অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছেন—জীবন, স্বাস্থ্য, পরিবার, রিজিক। কিন্তু অনেক মানুষ এই নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে অহংকার করে বলে—“আমার পরিশ্রমেই আমি সফল।”

এই কথাটি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করা, যা কুফর নিআমাহ (নিয়ামতের কুফর)।

কৃতজ্ঞতা না থাকলে মানুষ ধীরে ধীরে ঈমান হারায় এবং কুফরের পথে চলে যায়।

১১. মিথ্যা ধর্মীয় ধারণা ও বিকৃত বিশ্বাস:সমাজে কিছু মানুষ এমন ধারণা প্রচার করে যে, “সব পথেই আল্লাহর কাছে পৌঁছানো যায়,” বা “সব ধর্মের মূল এক।”

এই ধারণাগুলো মানুষকে সত্য তাওহিদ থেকে দূরে নিয়ে যায়। ইসলাম স্পষ্টভাবে বলে—আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র ধর্ম হলো ইসলাম। তাই এই বিকৃত বিশ্বাসও কুফরের প্রকাশ।

১২. নামমাত্র মুসলিম সমাজে শিরকের সূক্ষ্ম রূপ:আজকের মুসলিম সমাজেও দেখা যায়—অনেকে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, কিন্তু বিশ্বাসে ও আচরণে শিরকের ছাপ থাকে। যেমন—কবর বা পীরের কাছে দোয়া করা।সন্তান বা ব্যবসার জন্য “তাবিজ-পীরের পানি” নেওয়া।সফলতার কৃতিত্ব নিজের ওপর নেওয়া।

এই সূক্ষ্ম শিরকগুলো খুব বিপজ্জনক, কারণ এগুলো তাওহিদের মূলকে নষ্ট করে দেয় অথচ মানুষ তা বুঝতেও পারে না।

সমাজে কুফর ও শিরক নানা রূপে বিদ্যমান—কখনো প্রকাশ্য, কখনো সূক্ষ্মভাবে। আধুনিকতার নামে, সংস্কৃতি বা ব্যক্তিস্বাধীনতার অজুহাতে মানুষ আজ আল্লাহর একত্বকে ভুলে যাচ্ছে।

তাই প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব হলো—নিজের ঈমান পর্যালোচনা করা, কুফরি ও শিরকের যেকোনো চিহ্ন থেকে দূরে থাকা, এবং সমাজকে তাওহিদের পথে আহ্বান করা।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সমাজকে কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে তাওহিদের আলোয় আলোকিত করুন। আমিন।

কুফর ও শিরকের বিরুদ্ধে ইসলামী অবস্থান

ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যার ভিত্তি একমাত্র আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বাসকে বলা হয় তাওহিদ। তাওহিদ হচ্ছে ইসলামী আকীদার মূল ও ভিত্তি। এর বিপরীতে কুফর ও শিরক হলো সেই দুইটি গুরুতর অপরাধ, যা মানুষের ঈমান ধ্বংস করে দেয় এবং তাকে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে। ইসলামের দৃষ্টিতে কুফর ও শিরকের কোনোরূপ গ্রহণযোগ্যতা নেই; বরং এ দুটির বিরুদ্ধে ইসলাম অত্যন্ত কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে।

কুফর অর্থ অশিষ্টাচার, অকৃতজ্ঞতা বা আল্লাহর আদেশ অস্বীকার করা। কুফর মূলত আল্লাহ, তাঁর রাসূল ﷺ এবং পরকালসহ ইসলামের মৌলিক সত্যগুলো অস্বীকার করাকে বোঝায়। আর শিরক অর্থ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা, অর্থাৎ ইবাদত, দোয়া, ভালোবাসা, ভয় কিংবা আনুগত্যে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক করা।

কোরআনুল কারিমে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করা ক্ষমা করবেন না; কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা, অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপন করে, সে তো মহাপাপ করেছে।” (সূরা আন-নিসা-৪:৪৮)

ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কুফর ও শিরক এমন অপরাধ, যা তাওবা ছাড়া কখনও ক্ষমাযোগ্য নয়। নবী করিম ﷺ মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হিসেবে কুফর ও শিরক থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তাঁর সমগ্র নবুয়তি জীবনে মানুষকে এক আল্লাহর উপাসনা ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেছেন। মক্কার মুশরিকরা যখন একাধিক দেব-দেবীর উপাসনা করত, তখন নবী ﷺ দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দিয়েছিলেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ”, অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। এই ঘোষণার মাধ্যমেই তিনি মুশরিক সমাজের মূর্তিপূজা, কুফরি ও অশিষ্টাচারের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

কোরআন ও হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কুফর ও শিরক সমাজে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার ও মানবতার শত্রু। এদের কারণে মানুষ অহংকারী, স্বার্থপর এবং ন্যায় থেকে বিচ্যুত হয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস রাখে না, তার সকল সৎকর্ম অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন —

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَجْرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“যে ব্যক্তি কুফর করে, তার কর্ম বৃথা হয়ে যায় এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (সূরা আল-মায়িদা-৫:৫)

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায়ও কুফর ও শিরকের প্রচারকে রোধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কারণ, এগুলো শুধু ধর্মীয় বিশ্বাসের বিকৃতি নয়; বরং সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি ধ্বংস করে দেয়। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যেখানে সব মানুষ এক আল্লাহর ইবাদত করবে, ন্যায় ও সত্যের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করবে, এবং কোনো প্রকার কুফর বা শিরকের স্থান থাকবে না।

অতএব, একজন মুসলমানের ঈমানের পূর্ণতা নির্ভর করে এই ব্যাপারে তার দৃঢ় অবস্থানের উপর—সে যেন কুফর ও শিরকের সব রূপ ও মাধ্যম থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদতে নিবেদিত হওয়াই ইসলামী জীবনের মর্মকথা। ইসলামের দৃষ্টিতে এটাই মুক্তির একমাত্র পথ। যারা কুফর ও শিরক থেকে বিরত থেকে তাওহিদে অবিচল থাকবে, আল্লাহ তাঁদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইসলাম কুফর ও শিরককে মানবজাতির সবচেয়ে বড় বিপদ হিসেবে ঘোষণা করেছে। এগুলোর বিরুদ্ধে ইসলামের অবস্থান একদম পরিষ্কার—কোনো আপোষ নয়, কোনো নয়। আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসই হলো ঈমানের ভিত্তি, মুক্তির পথ এবং মানবজীবনের প্রকৃত সফলতার চাবিকাঠি।

অন্যায়, জুলুম ও অহংকার

মানবজীবন ন্যায়, সত্য, বিনয় ও পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে সমাজে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। কিন্তু যখন মানুষ অন্যায়, জুলুম ও অহংকারে লিপ্ত হয়, তখন সমাজে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও অবিচারের জন্ম নেয়। ইসলাম একটি ন্যায়ভিত্তিক ধর্ম—যেখানে প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষিত এবং প্রতিটি অন্যায় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে পারস্পরিক ন্যায়বিচার, দয়া ও নম্রতা অবলম্বন করতে বলেছেন এবং অন্যায়, জুলুম ও অহংকারকে অপছন্দ করেছেন। কারণ এই তিনটি গুণ মানুষের আত্মিক ও সামাজিক জীবনে সবচেয়ে বড় ধ্বংস ডেকে আনে।

অন্যায় এমন একটি পাপ, যা কেবল একজন ব্যক্তিকে নয়, বরং গোটা সমাজকে অশান্তির দিকে ঠেলে দেয়। এটি ন্যায়বিচারকে ধ্বংস করে এবং মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভালোবাসা নষ্ট করে ফেলে। ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়াকে ঈমানের অংশ হিসেবে ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে, জুলুম বা অত্যাচার এমন এক কাজ যা অন্যের অধিকার হরণ করে এবং দুর্বলকে নিপীড়িত করে। একজন মানুষ যখন নিজের ক্ষমতা, অর্থ বা প্রভাব ব্যবহার করে অন্যকে কষ্ট দেয়, তখন সে আল্লাহর কঠিন গজবের মুখোমুখি হয়।

অন্যদিকে অহংকার এমন একটি গুণ যা মানুষের অন্তরকে কলুষিত করে এবং তাকে সত্য ও বিনয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। অহংকার শয়তানের প্রথম পাপ—যে কারণে সে আদম (আ.)-এর সামনে সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল। আল্লাহ বলেন—

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

“আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা করো,’ তখন তারা সিজদা করল, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করল, অহংকার করল এবং কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।” (সূরা আল-বাকারা -২:৩৪)

অহংকারের কারণে মানুষ অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, নিজের ভুল স্বীকার করে না এবং আল্লাহর আদেশ অমান্য করে। ইসলাম শেখায় যে, আসল শ্রেষ্ঠত্ব গর্ব বা বংশে নয়, বরং তাকওয়া ও সৎকর্মে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (সহিহ মুসলিম)

অতএব, অন্যায়, জুলুম ও অহংকার—এই তিনটি ধ্বংসাত্মক দোষ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। অন্যায়ের বীজ থেকে জন্ম নেয় জুলুম, আর জুলুমের ভিত্তিতে শক্ত করে অহংকার। যে ব্যক্তি অহংকারী হয়, সে সাধারণত অন্যায়ের পথে চলে এবং মানুষকে অবজ্ঞা করে। ইসলাম মানুষকে এই তিনটি দোষ থেকে মুক্ত থেকে বিনয়, ন্যায়বিচার ও মানবতার পথে চলার আহ্বান জানায়।

মানবসমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রতিটি মানুষের উচিত নিজেকে অন্যায়, জুলুম ও অহংকার থেকে মুক্ত রাখা। কারণ এই তিনটি দোষ না শুধুমাত্র মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট করে, বরং আল্লাহর রহমত থেকেও বঞ্চিত করে। তাই মুসলমানদের কর্তব্য হলো সর্বক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা, অন্যের অধিকার রক্ষা করা এবং বিনয়ীভাবে আল্লাহর আদেশ মেনে চলা। এভাবেই সমাজে প্রকৃত শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও ঈমানের সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সমাজ এবং রাষ্ট্রে অন্যায় জুলুম ও অহংকারের প্রভাব

মানব সমাজের স্থিতি ও অগ্রগতির জন্য ন্যায়বিচার, সহানুভূতি এবং বিনয় অপরিহার্য। কিন্তু যখন সমাজে অন্যায়, জুলুম ও অহংকারের প্রভাব বিস্তার লাভ করে, তখন সেই সমাজ ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হয়। অন্যায় মানে হলো ন্যায়ের বিপরীত কাজ করা—যেখানে একজনের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় বা অন্যকে কষ্ট দেওয়া হয়। জুলুম হচ্ছে শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা দুর্বলদের ওপর অন্যায়ভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ। আর অহংকার হলো আত্মগর্ব, যা মানুষকে নিজের সীমা ও বাস্তবতা ভুলিয়ে দেয়। ইসলাম ও নৈতিকতার প্রতিটি শিক্ষা অন্যায়, জুলুম ও অহংকার থেকে বিরত থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে, কারণ এগুলোই সমাজ ও রাষ্ট্র ধ্বংসের মূল কারণ।

সমাজে অন্যায় জুলুমের প্রভাব: অন্যায় ও জুলুম সমাজে ন্যায়বোধকে ধ্বংস করে দেয়। যখন ধনী, প্রভাবশালী বা ক্ষমতাবানরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করে এবং তার বিচার হয় না, তখন সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচারের আশা হারিয়ে ফেলে। এতে সমাজে অবিশ্বাস, বিদ্বেষ ও ঘৃণা বৃদ্ধি পায়। মানুষ একে অপরের প্রতি সহযোগিতা ও সহমর্মিতা হারিয়ে ফেলে। সমাজে অনিরাপত্তা, দারিদ্র্য ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অন্যায়ের কারণে শিক্ষিত ও নৈতিক মানুষ পিছিয়ে যায়, আর দুর্নীতিবাজ ও অত্যাচারীরা ক্ষমতার আসনে বসে যায়। ফলে সমাজে ন্যায়ের পরিবর্তে ভীতি ও হতাশার সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যেখানে জুলুম বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখানে বিদ্রোহ ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

রাষ্ট্রে অন্যায় জুলুমের প্রভাব: রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হলো ন্যায়বিচার। যদি রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী বা প্রশাসন অন্যায় ও জুলুমকে প্রশ্রয় দেয়, তবে সেই রাষ্ট্র স্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে না। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অন্যায় মানে হলো বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতা, দুর্নীতি, পক্ষপাতিত্ব ও ক্ষমতার অপব্যবহার। জুলুম যখন আইন প্রয়োগকারীর হাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন জনগণের আস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য ভেঙে পড়ে। ফলস্বরূপ দেশজুড়ে অস্থিরতা, আন্দোলন ও সংঘর্ষের জন্ম হয়। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে সতর্ক করে বলেছেন—

وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا يُحِبُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ

“আর তোমরা জুলুম করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদের ভালোবাসেন না।” (সূরা আলে ইমরান,

৩:৫৭)

অর্থাৎ অন্যায় ও জুলুম আল্লাহর ক্রোধ আহ্বান করে, যা একটি জাতির পতন ডেকে আনে। অহংকারের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষতি: অহংকার মানুষকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। অহংকারী ব্যক্তি নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করে এবং অন্যদের ছোট করে দেখে। সমাজে অহংকার ছড়িয়ে পড়লে বিনয়, সহমর্মিতা ও শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শাসক বা নেতা অহংকারী হলে তিনি জনগণের মতামতকে অগ্রাহ্য করেন, সমালোচনাকে শত্রুতা মনে করেন এবং একনায়কতান্ত্রিক শাসন কায়েম করেন। এর ফলে জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ ও অবিশ্বাস জন্ম নেয়। ইতিহাসে ফেরাউন, নামরুদ, কারুন প্রমুখ অহংকারী শাসকদের পতনের ঘটনাই এর প্রমাণ। কোরআনে আল্লাহ বলেন—

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারী ও গর্বিতদের ভালোবাসেন না।” (সূরা আন-নিসা, ৪:৩৬)

অর্থাৎ অহংকার কেবল ব্যক্তির নয়, পুরো জাতির ধ্বংস ডেকে আনে।

অন্যায়, জুলুম ও অহংকারের পরিণতি

যে সমাজে অন্যায় ও জুলুমের আধিপত্য স্থাপিত হয়, সেখানে আল্লাহর রহমত নেমে আসে না। সেই সমাজে শান্তি থাকে না, বরং ভয়, হিংসা, ও বৈরিতার বিস্তার ঘটে। রাষ্ট্র যখন অন্যায়ের আশ্রয় নেয়, তখন তার অর্থনীতি দুর্বল হয়, প্রশাসন ভেঙে পড়ে, এবং বিদেশি শক্তি সুযোগ নেয়। অহংকারের কারণে নেতারা ভুল সিদ্ধান্ত নেয়, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত নিজেদের পতন ডেকে আনে। ইতিহাসে রোম, পারস্য ও আন্দালুসের পতনের মূল কারণই ছিল অন্যায়, জুলুম ও অহংকার।

অন্যায়, জুলুম ও অহংকার দূর করতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ন্যায়বিচার, শিক্ষা এবং আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের দায়িত্ব ও সীমা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। আল্লাহভীতির মাধ্যমে মানুষ অন্যায় ও অহংকার থেকে দূরে থাকতে পারে। সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহানুভূতি এবং দায়িত্ববোধ গড়ে তুললে অন্যায় ও জুলুম হ্রাস পাবে এবং রাষ্ট্রে শান্তি ও স্থিতি ফিরে আসবে।

সর্বোপরি বলা যায়, অন্যায়, জুলুম ও অহংকার সমাজ ও রাষ্ট্রের শত্রু। ন্যায়, বিনয় ও মানবিকতা ছাড়া কোনো সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। তাই আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য

হলো—ন্যায়ের পথে চলা, জুলুমের বিরোধিতা করা, ও বিনয়ের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করা।

অন্যায়, জুলুম ও অহংকার সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর বানী

রাসূলুল্লাহ ﷺ সমগ্র মানবজাতির জন্য এক পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টান্ত। তাঁর শিক্ষা ও জীবনাচরণে ন্যায়, সত্য, বিনয় ও করুণার প্রতিফলন ছিল সর্বদা। তিনি মানবজাতিকে অন্যায়, জুলুম ও অহংকারের ভয়াবহতা সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। কারণ এই তিনটি গুণ মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে এবং সমাজে অশান্তি ও ধ্বংস ডেকে আনে। রাসূল ﷺ ন্যায়বিচারকে ইসলামী সমাজের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং অন্যায়, জুলুম ও অহংকার থেকে দূরে থাকার জন্য অসংখ্য হাদিসে উপদেশ দিয়েছেন।

অন্যায় সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর বানী: অন্যায় (অন্যের হক লঙ্ঘন) ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। রাসূল ﷺ বলেছেন —

“তোমরা অন্যায় থেকে সাবধান থাকো, কারণ অন্যায় কিয়ামতের দিনে অন্ধকারে পরিণত হবে।” (সহিহ মুসলিম)

এই হাদিসে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, অন্যায় শুধু দুনিয়ায় অশান্তি আনে না, বরং আখিরাতে তা কঠিন পরিণতি ডেকে আনে। যিনি অন্যায় করেন, তিনি সাময়িকভাবে লাভবান মনে হলেও, বাস্তবে তার আত্মা শান্তি হারায়। রাসূল ﷺ আরও বলেছেন —

“তোমার ভাইয়ের প্রতি সাহায্য করো, সে যদি জালিম হয় কিংবা মজলুম হয়।”

সহচররা জিজ্ঞেস করলেন, “মজলুম হলে তো সাহায্য করা বোঝা যায়, কিন্তু জালিম হলে কীভাবে সাহায্য করবো?”

রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন —

“তুমি তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে, এটিই তার প্রতি সাহায্য।” (সহিহ বুখারি)

এই হাদিসের মাধ্যমে নবী ﷺ ন্যায় প্রতিষ্ঠার এক মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে অন্যায়কারীকে সমর্থন নয়, বরং থামিয়ে দেওয়াই প্রকৃত সহায়তা। এটি ন্যায়বিচারের মূল দর্শন, যা সমাজে ভারসাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

জুলুম সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর বানী: জুলুম মানে হলো সীমা অতিক্রম করে অন্যের ওপর অবিচার করা। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল ﷺ বারবার মানুষকে জুলুম থেকে সাবধান করেছেন। নবী ﷺ বলেছেন —

“জালিমের জুলুম থেকে সাবধান হও, কারণ মজলুমের দোয়া আল্লাহর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয় না।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

এই বানীতে রাসূল ﷺ জুলুমকারীর ভয়াবহ পরিণতি ও মজলুমের মর্যাদা তুলে ধরেছেন। জুলুম করা মানে শুধু অন্যকে ক্ষতি করা নয়, বরং নিজের বিরুদ্ধে আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনা। অন্য এক হাদিসে তিনি বলেন —

“যে ব্যক্তি এক বিঘা জমিও অন্যায়ভাবে দখল করে, কিয়ামতের দিন তাকে সাত স্তর জমি পর্যন্ত শৃঙ্খলিত করা হবে।” (সহিহ বুখারি)

এতে বোঝা যায়, ইসলাম জুলুমকে কতটা ঘৃণা করে। রাসূল ﷺ কখনোই অন্যের অধিকার হরণ করতে দেননি। তিনি তাঁর শাসনকালেও সর্বদা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছেন। এমনকি একবার এক নারী চুরি করলে অনেকে সুপারিশ করতে চেয়েছিল, তখন নবী ﷺ বলেন—

“আল্লাহর কসম, যদি ফাতিমা (আমার কন্যা) ও চুরি করতো, তবে আমিও তার হাত কেটে দিতাম।” (সহিহ বুখারি)

এই বাণী তাঁর ন্যায়ের প্রতি অটল অবস্থান প্রমাণ করে, যেখানে জুলুম বা পক্ষপাতের কোনো স্থান নেই।

অহংকার সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর বানী: অহংকার হলো শয়তানের প্রথম পাপ। রাসূল ﷺ অহংকারকে সবচেয়ে ভয়াবহ মানসিক রোগ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন —

“যার হৃদয়ে এক কণামাত্র অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।” (সহিহ মুসলিম)

এই হাদিসে অহংকারের মারাত্মক পরিণতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। অহংকারী মানুষ মনে করে সে অন্যদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু বাস্তবে সে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট হয়ে পড়ে। রাসূল ﷺ আরও বলেছেন —

“আল্লাহ বলেছেন: মহত্ব আমার চাদর এবং গরিমা আমার পোশাক। যে কেউ এ দুটিতে আমার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব।” (সহিহ মুসলিম)

এই হাদিসের মাধ্যমে বোঝা যায়, অহংকার আল্লাহর বৈশিষ্ট্যের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। মানুষ যখন নিজের ক্ষমতা বা সম্পদ নিয়ে গর্ব করে, তখন সে আল্লাহর অনুগ্রহ ভুলে যায় এবং নিজেই নিজের ধ্বংস ডেকে আনে।

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিনয় ও নম্রতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি নিজে সাধারণ পোশাক পরতেন, দাসদের সঙ্গে একত্রে আহার করতেন এবং কখনো অহংকার করেননি। এমনকি মক্কা বিজয়ের দিনও তিনি উটের পিঠে মাথা নিচু করে আল্লাহর সামনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এটি ছিল বিনয়ের সর্বোচ্চ উদাহরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবন ও বাণী থেকে আমরা জানতে পারি যে, অন্যায়, জুলুম ও অহংকার মানব জীবনের জন্য সর্বনাশ। তিনি ন্যায়বিচার, বিনয় ও দয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও মানবতার ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে—

ন্যায়বিচার ছাড়া সমাজ টেকে না, জুলুমের ফল ধ্বংস, আর অহংকারের পরিণতি আল্লাহর ক্রোধ।

অতএব, একজন প্রকৃত মুসলমানের কর্তব্য হলো অন্যায় থেকে দূরে থাকা, জুলুম প্রতিরোধ করা এবং বিনয়ী মনোভাব ধারণ করা। তবেই আমরা রাসূল ﷺ এর দেখানো পথে চলতে পারবো এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হবো।

তাই যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্যায়, জুলুম ও অহংকারে নিমজ্জিত হয়, তার জীবন প্রকৃত অর্থে ব্যর্থতায় পরিণত হয়। দুনিয়ার মোহে মানুষ প্রায়ই ভুলে যায় যে প্রতিটি কাজের হিসাব আল্লাহর দরবারে দিতে হবে। অন্যায় ও জুলুম মানুষকে যেমন সমাজে নিন্দিত করে, তেমনি আখিরাতে তা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“আর অন্যায়কারীদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” (সূরা গুরা, ৪২:৪২)

এটি প্রমাণ করে যে, দুনিয়ার ক্ষমতা বা প্রভাব অন্যায়কারীর মুক্তির নিশ্চয়তা নয়। বরং আল্লাহর ন্যায়বিচারের আদালতে তার প্রতিটি জুলুমের জবাব তাকে দিতে হবে।

অন্যায় জুলুম ও অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি

অন্যায় ও জুলুম কেবল ব্যক্তিগত পাপ নয়, এটি সামাজিক অপরাধও বটে। কারণ, এর দ্বারা সমাজের ন্যায়বোধ ধ্বংস হয়ে যায়, দুর্বলদের অধিকার লঙ্ঘিত হয় এবং ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি নষ্ট হয়ে পড়ে। জুলুমকারীরা হয়তো দুনিয়ায় নিরাপদ মনে করে, কিন্তু আখিরাতে তারা হবে লাঞ্চিত ও পরাজিত। অর্থাৎ, জালিমরা সেদিন অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকবে, তাদের কোনো আলো বা দিকনির্দেশনা থাকবে না।

অন্যায়ের ভয়াবহ পরিণতি: অন্যায় এমন এক গুনাহ যা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন শাসক, ধনী বা প্রভাবশালীরা অন্যায়কে স্বাভাবিক মনে করে, তখন সমাজে ন্যায়বিচার বিলুপ্ত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বারবার সতর্ক করেছেন যে, কোনো জাতি অন্যায় করলে তিনি তাদের ধ্বংস করে দেন। যেমন বলা হয়েছে—

فَلَا تَخَافُوا نَفْسَتِي وَفَدَّ أَهْلُكُنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا

“আমার প্রতিশোধ ভয় করো না, অথচ যারা অন্যায় করেছিল, তাদের আমি ধ্বংস করেছি।”

(সূরা ইউনুস-১০:১৩)

অর্থাৎ, অন্যায় দুনিয়ার উন্নত জাতিকেও পতনের মুখে ঠেলে দেয় এবং আখিরাতে তাদের জন্য অপেক্ষা করে কঠিন শাস্তি।

আখিরাতে অন্যায়কারীদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হবে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া। আল্লাহর রহমত ছাড়া মুক্তির কোনো পথ নেই। অন্যের অধিকার নষ্টকারী, ঘুষখোর, প্রতারক

বা নিরপরাধের ক্ষতি সাধনকারী ব্যক্তি আখিরাতে মুক্তি পাবে না যতক্ষণ না সে ভুক্তভোগীর হক ফেরত দেয়। এক হাদিসে এসেছে,

“কেয়ামতের দিন অন্যায়কারী তার সৎকর্ম দিয়ে ক্ষতিপূরণ দেবে; যদি সৎকর্ম শেষ হয়ে যায়, ভুক্তভোগীদের পাপ তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং শেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে “ (সহিহ মুসলিম)

এটি প্রমাণ করে যে, আখিরাতে ন্যায়বিচার এতই সূক্ষ্ম হবে যে কোনো অন্যায়ই আড়াল থাকবে না।

অহংকারের ভয়াবহতা ও পরিণতি: অহংকার মানবের সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক মানসিক রোগগুলোর একটি। এটি মানুষকে সত্য অস্বীকার করতে ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে বাধ্য করে। দুনিয়ার বহু মানুষ নিজের সম্পদ, জ্ঞান, সৌন্দর্য বা ক্ষমতার গর্বে আত্মসন্ত্রিসিত হয়ে ভোগে। অথচ এসবই আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত। অহংকারী মানুষ মনে করে সে কখনো পতিত হবে না, কিন্তু আখিরাতে তার অহংকার ভেঙে যাবে, সে লাঞ্চিত হয়ে উঠবে।

এই বাণী স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে অহংকার আখিরাতে সফলতার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কেয়ামতের দিনে অহংকারীরা হবে সবচেয়ে নীচু অবস্থানে; তাদের মুখে থাকবে অনুশোচনা ও অপমানের ছাপ। আল্লাহ তায়ালা বলেন— দুনিয়ায় যারা গর্বে বুক ফুলিয়ে চলত, তারা সেদিন হবে লাঞ্চিত ও অবমানিত।

অহংকার শুধু ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, এটি আল্লাহর একচ্ছত্র মহিমার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার চেষ্টা। আল্লাহ একমাত্র মহান, তাই যে ব্যক্তি অহংকারে মত্ত থাকে, সে আল্লাহর মহিমাকে অস্বীকার করে। ফলে সে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়, এবং আখিরাতে তার কোনো মর্যাদা থাকে না।

অন্যায়, জুলুম ও অহংকার— এই তিনটি মানব সমাজের পতন ও আখিরাতে ব্যর্থতার মূল কারণ। দুনিয়ার জীবনে এদের প্রভাবে মানুষ ন্যায়বিচার হারায়, অন্যের হক নষ্ট করে, আর আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কিন্তু আখিরাতে এসবের ভয়াবহ প্রতিফল তাকে ভোগ করতে হবে। সেখানে কোনো ক্ষমতা, ধন-সম্পদ, আত্মীয় বা বন্ধুর সহায়তা থাকবে না। আল্লাহ বলেন—

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ • إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“সেদিন সম্পদ বা সন্তান কিছুই উপকারে আসবে না, শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে এসেছে।” সূরা আশ-শু'আরা, ২৬:৮৮-৮৯)

অতএব, একজন মুমিনের কর্তব্য হলো নিজেকে অন্যায় ও অহংকার থেকে দূরে রাখা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, এবং বিনয়ী আচরণে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। সমাজে শান্তি ও

ন্যায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়া যেমন সুন্দর হবে, তেমনি আখিরাতেও সফলতা লাভ করা সম্ভব হবে।

অন্যায়ের পথ যতই আকর্ষণীয় মনে হোক না কেন, তার শেষ পরিণতি ধ্বংস। অহংকার যতই মিষ্টি লাগুক, তা আল্লাহর ক্রোধ ডেকে আনে। তাই আল্লাহভীতির মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জনই হলো আখিরাতে মুক্তির একমাত্র উপায়। যারা আল্লাহর নির্দেশ মানবে, অন্যের প্রতি সদাচার করবে এবং বিনয় অবলম্বন করবে— আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ।

অন্যায়, জুলুম ও অহংকার দুনিয়ায় যেমন মানুষকে অন্যের ঘৃণার পাত্র করে তোলে, তেমনি আখিরাতে আল্লাহর ক্রোধ ও জাহান্নামের শাস্তি ডেকে আনে। আখিরাতে সফল হতে চাইলে আল্লাহভীতি, ন্যায়বিচার ও বিনয়ই হতে হবে আমাদের জীবনের মূল নীতি।

হালাল ও হারামের প্রতি উদাসীনতা

ইসলাম এমন একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যা মানুষের জীবনের প্রতিটি দিককে সঠিক পথে পরিচালিত করার নির্দেশ দেয়। এই দিকনির্দেশনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো “হালাল ও হারাম” এর বিধান। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য এবং তাকে দিয়েছেন বুদ্ধি ও বিবেক যাতে সে সঠিক ও বেঠিকের পার্থক্য করতে পারে। ইসলাম শেখায়—যা কিছু আল্লাহ বৈধ করেছেন তা গ্রহণ করা হালাল, আর যা তিনি নিষিদ্ধ করেছেন তা হারাম। এই সীমারেখা মেনে চলা ঈমানদারের কর্তব্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ। কিন্তু বর্তমান যুগে দেখা যায়, অনেক মানুষ হালাল-হারামের পার্থক্য ভুলে গিয়ে উদাসীনতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে। এই উদাসীনতা কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয়েরও কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মানুষ আজ দুনিয়ার মোহ, ভোগ-বিলাস ও অর্থলোভে এমনভাবে আবদ্ধ যে, সে আর রিজিকের উৎস যাচাই করতে চায় না—তা হালাল না হারাম, তা নিয়ে তার কোনো চিন্তা নেই। অথচ ইসলাম শেখায়, হালাল উপার্জনই দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম, আর হারাম উপার্জন আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও গজব ডেকে আনে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সতর্ক করে বলেছেন,

আজ আমরা সেই সময়ের বাস্তব চিত্র প্রত্যক্ষ করছি—ঘুষ, সুদ, প্রতারণা, মিথ্যা ও অন্যায় লেনদেন মানুষের জীবনে এমনভাবে মিশে গেছে যে অনেকেই সেগুলোকে স্বাভাবিক বিষয় মনে করছে। এই উদাসীনতা আসলে ঈমানের দুর্বলতা ও আত্মিক মৃত্যুর লক্ষণ।

হালাল ও হারামের প্রতি উদাসীনতা শুধু ব্যক্তিগত পাপ নয়; এটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যও ভয়াবহ ক্ষতির কারণ। যখন সমাজের অধিকাংশ মানুষ হারাম উপার্জনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে শুরু করে, তখন বরকত উঠে যায়, অন্যায়ের বিস্তার ঘটে এবং ন্যায়বিচার বিলুপ্ত হয়। মানুষ তখন অন্যের অধিকার হরণে দ্বিধা করে না, আল্লাহভীতি হারিয়ে ফেলে। এর ফলেই দেখা দেয় অশান্তি, নৈতিক পতন, এবং মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ উদাসীনতা এমন এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যা মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং আখিরাতে ভয়াবহ শাস্তির কারণ হয়।

অতএব, হালাল ও হারামের প্রতি উদাসীনতা শুধু একটি নৈতিক দুর্বলতা নয়, বরং এটি ঈমানের পরিপন্থী আচরণ। একজন মুসলমানের জন্য জরুরি হলো, সে যেন প্রতিটি কাজের আগে চিন্তা করে দেখে—এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় কিনা। হালাল পথে উপার্জন, হালাল খাদ্য গ্রহণ, এবং হালাল আচরণই একজন মুমিনের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে। তাই আমাদের উচিত হালাল-হারামের পার্থক্য জানা, হারাম থেকে দূরে থাকা এবং আল্লাহভীতির মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করা।

হালাল ও হারামের প্রতি উদাসীনতার কারণ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যেখানে হালাল ও হারামের স্পষ্ট সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু আজকের সমাজে মানুষ এই সীমারেখার প্রতি দিন দিন উদাসীন হয়ে পড়ছে। দুনিয়ার মোহ, ভোগ-বিলাসিতা, আর ঈমানের দুর্বলতা মানুষকে এমন এক অবস্থায় নিয়ে গেছে যেখানে সে আর রিজিকের উৎস, আচরণ কিংবা উপার্জনের বৈধতা নিয়ে চিন্তিত নয়। এই উদাসীনতার পেছনে রয়েছে বহু কারণ, যা একে একে মানবজীবন ও সমাজে গভীর প্রভাব ফেলছে।

প্রথমত-ঈমান ও তাকওয়ার দুর্বলতা হলো সবচেয়ে বড় কারণ। যখন মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি কমে যায়, তখন সে হারাম ও হালালের পার্থক্যকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। ঈমান দুর্বল হলে মানুষ মনে করে—দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই আসল জীবন, অথচ আখিরাতের জবাবদিহিতা তার চোখে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। ফলে হারাম পথে উপার্জন, মিথ্যা বলা, অন্যের অধিকার হরণ করা তার কাছে অপরাধ মনে হয় না। আল্লাহভীতি ও নৈতিক চেতনার অভাবই মানুষকে হারামের দিকে টেনে নিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত—দুনিয়াবি লোভ ও বস্তুবাদিতা হালাল-হারামের প্রতি উদাসীনতার আরেক বড় কারণ। বর্তমান যুগে অর্থকেই সফলতার মানদণ্ড মনে করা হয়। কেউ যত ধনী, সমাজে তার তত মর্যাদা—এই চিন্তাই মানুষকে হালাল-হারামের সীমা অতিক্রমে প্ররোচিত করে। অনেকেই দ্রুত ধনী হওয়ার লোভে ঘুষ, সুদ, প্রতারণা, জালিয়াতি, এমনকি অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করার মতো কাজেও জড়িয়ে পড়ে। অথচ ইসলাম স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে, হারাম সম্পদে কোনো বরকত নেই; বরং তা দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস ডেকে আনে।

তৃতীয়ত—ইসলামি জ্ঞানের অভাব ও ধর্মীয় শিক্ষার অবহেলা উদাসীনতার অন্যতম কারণ। আজকের প্রজন্মের অনেকেই ইসলামের মৌলিক বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা জানেই না কোন কাজ হালাল, কোনটি হারাম। ফলে অজান্তেই অনেক সময় হারাম পথে চলে যায়, আবার সচেতনভাবে তা উপেক্ষাও করে। ইসলামি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়া মানুষকে কেবলই জাগতিক জীবনের দাসে পরিণত করে, যেখানে আল্লাহর বিধান আর কোনো মূল্য পায় না।

চতুর্থত—সমাজ ও পরিবেশের প্রভাব মানুষকে হালাল-হারামের প্রতি উদাসীন করে তোলে। যখন সমাজে হারাম উপার্জন, অসততা, ঘুষ বা প্রতারণা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হয়, তখন মানুষও সেই পথ অনুসরণ করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে সমাজে এমন মানসিকতা তৈরি হয়—“সবাই করছে, আমিও করব।” এই প্রবণতা নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম দেয় এবং সত্যিকার ধর্মনিষ্ঠ মানুষদেরও বিপথে ঠেলে দেয়।

পঞ্চমত—মিডিয়া ও আধুনিক সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ। চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন বার্তা ছড়ানো হয় যেন বিলাসিতা, নাম-

খ্যাতি ও সম্পদ অর্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ফলে মানুষ হালাল পথে ধীরে চলতে চায় না, বরং শর্টকাট বা হারাম উপায়ে সাফল্য অর্জনের পথে ধাবিত হয়।

সবশেষে-আত্মসমালোচনার অভাব ও তাওবা থেকে দূরে থাকা মানুষকে উদাসীনতার গভীরে ঠেলে দেয়। যখন মানুষ নিজের কাজের হিসাব নেয় না, নিজের ভুল উপলব্ধি করে না, তখন সে ধীরে ধীরে হারামকে বৈধ মনে করতে শুরু করে। তাওবার দরজা খোলা থাকা সত্ত্বেও সে সেই দিকে ফিরতে চায় না, কারণ তার অন্তর কঠিন হয়ে গেছে।

সুতরাং বলা যায়, হালাল ও হারামের প্রতি উদাসীনতার মূল কারণ হলো ঈমানের দুর্বলতা, দুনিয়াবি লোভ, ইসলামি জ্ঞানের অভাব, সামাজিক প্রভাব, এবং আত্মসমালোচনার ঘাটতি। এই উদাসীনতা কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতির নয়, বরং সমাজের সার্বিক নৈতিক পতনের সূচনা করে। তাই প্রয়োজন আল্লাহভীতি জাগ্রত করা, ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা, এবং আত্মাকে পরিশুদ্ধ রাখার চেষ্টা করা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হালালকে আঁকড়ে ধরে ও হারাম থেকে বিরত থাকে, সে-ই প্রকৃত অর্থে সফল মুমিন।

আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূল (সা.) এর সতর্কবাণী

হালাল ও হারামের বিষয়টি ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য জীবনব্যবস্থার সব দিকেই হালাল ও হারামের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যাতে মানুষ সঠিক পথ অবলম্বন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা অর্জন করতে পারে। কুরআনে অসংখ্য স্থানে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন—যে জিনিসগুলো হালাল, তা গ্রহণ করতে এবং যেগুলো হারাম, সেগুলো থেকে দূরে থাকতে। তিনি বলেন,

“يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ”

“হে মানুষ! তোমরা পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র আছে, তা খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সূরা আল-বাকার-আয়াত ১৬৮)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হালাল উপার্জন ও বিশুদ্ধ খাদ্য গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে, যে মানুষকে সবসময় হারামের দিকে টেনে নেয়।

আরেক স্থানে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

“হে মুমিনগণ! আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি, তার মধ্যে থেকে হালাল ও পবিত্র অংশ থেকে খাও এবং যদি তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর, তবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।” (সূরা

এই নির্দেশের মাধ্যমে বোঝা যায়, হালাল উপার্জন শুধু শারীরিক খাদ্যের উৎস নয়, বরং আত্মিক বিশুদ্ধতারও মূল। হালাল রিজিক একজন মানুষকে আল্লাহর নিকটে প্রিয় করে তোলে এবং তার দোয়া কবুল হওয়ার পথ প্রশস্ত করে। বিপরীতে, হারাম উপার্জন মানুষের আমল নষ্ট করে দেয় এবং আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত করে।

অর্থাৎ, প্রতারণা, ঘুষ, সুদ, জালিয়াতি কিংবা অন্য কোনো অন্যায় উপায়ে সম্পদ অর্জন ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হালাল ও হারামের বিষয়ে তাঁর উম্মতকে অত্যন্ত সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন,

“এক সময় আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না তার উপার্জন হালাল না হারাম।” (সহিহ

বুখারি)

আজকের সমাজে আমরা দেখতে পাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তব হয়ে গেছে। মানুষ দ্রুত ধনী হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত, কিন্তু সে ভাবছে না তার উপার্জন বৈধ না অবৈধ। অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন,

“যে দেহ হারাম খাদ্যে পুষ্ট হয়, সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।” (মুসনাদ আহমাদ)

এই হাদীস আমাদের শেখায়, হারাম খাদ্য ও হারাম উপার্জন মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তির কারণ হয়।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট; আর এ দু’য়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে, যা অনেকেই জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয় থেকে বিরত থাকে, সে তার ধর্ম ও সম্মানকে রক্ষা করে।” (সহিহ বুখারি ও মুসলিম)

অর্থাৎ, একজন মুমিনের উচিত শুধু হারাম নয়, বরং সন্দেহজনক বিষয় থেকেও দূরে থাকা। কারণ এসব বিষয় ধীরে ধীরে মানুষকে হারামের দিকে নিয়ে যায়। রাসূল ﷺ এর এই উপদেশ মানবজীবনের নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

হালাল ও হারামের বিষয়ে রাসূল ﷺ আরও বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি কেবল পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন।” (সহিহ মুসলিম)

এর মাধ্যমে তিনি শিখিয়েছেন যে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে হালাল পথে চলা, হালাল উপার্জন করা এবং হালাল খাদ্য গ্রহণ করা অপরিহার্য। হারাম উপায়ে অর্জিত সম্পদ বা খাদ্য কখনও আল্লাহর নিকট গৃহীত হয় না। এমনকি হারাম রিজিকে পুষ্ট দেহ থেকে করা ইবাদতও কবুল হয় না।

অতএব, আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সতর্কবাণী আমাদের জন্য এক গভীর শিক্ষা বহন করে। হালাল ও হারাম কেবল একটি খাদ্য বা অর্থনৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি ঈমান, নৈতিকতা ও আখিরাতে মুক্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ

মেনে চলে, সে দুনিয়ায় বরকত ও প্রশান্তি পায়, আর যে ব্যক্তি হারামের প্রতি উদাসীন থাকে, তার জীবনে আসে অশান্তি, অভিশাপ ও আখিরাতে ভয়াবহ পরিণতি। তাই একজন মুমিনের কর্তব্য হলো হালাল ও হারামের বিষয়ে সর্বদা সচেতন থাকা এবং রাসূল ﷺ এর উপদেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। এভাবেই আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব এবং আখিরাতে জান্নাতের যোগ্য হতে পারব।

হালাল হারামের প্রতি উদাসীনতা বনাম চূড়ান্ত ব্যর্থতা

মানবজীবন আল্লাহ প্রদত্ত একটি আমানত, যা সঠিকভাবে পরিচালনার দায়িত্বও মানুষের নিজের উপর ন্যস্ত। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করার জন্য তাঁর কিতাব নাজিল করেছেন, যেখানে স্পষ্টভাবে হালাল ও হারামের বিধান নির্ধারিত আছে। হালাল হচ্ছে সেই সব বিষয়, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুমোদন দিয়েছেন। আর হারাম হচ্ছে সেই সব কাজ বা বস্তু, যা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন। একজন মুমিনের দায়িত্ব হলো, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা এবং হারাম থেকে বিরত থাকা। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, বর্তমান সমাজে দেখা যায় অনেকেই হালাল ও হারামের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে পড়েছে। তারা নিজেদের ইচ্ছা, লাভ-লোকসান ও পার্থিব সুবিধার জন্য আল্লাহর বিধানকে উপেক্ষা করছে।

এই উদাসীনতা মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয় এবং ধীরে ধীরে তাকে আল্লাহর নাফরমানিতে নিমজ্জিত করে। যখন মানুষ হালাল-হারামের পার্থক্য ভুলে যায়, তখন তার জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখা মুছে যায়। ফলে সমাজে দেখা দেয় দুর্নীতি, প্রতারণা, অন্যায়, অবিচার ও নৈতিক অবক্ষয়। হালাল রিজিকের গুরুত্ব সম্পর্কে ইসলাম স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছে। হাদীসে এসেছে, “হালাল রিজিকের সন্ধান করা প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ।” কারণ হালাল আহার শুধু শরীরকে নয়, আত্মাকেও পবিত্র করে। বিপরীতে হারাম উপার্জন মানুষের আত্মাকে কলুষিত করে, দোয়া কবুলে বাধা সৃষ্টি করে এবং আখিরাতে চূড়ান্ত ব্যর্থতার দিকে ঠেলে দেয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা হালাল ও পবিত্র তা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” (সূরা আল-বাকার, ২:১৬৮)

এই আয়াতটি মানুষকে সতর্ক করেছে যেন তারা কেবল হালাল ও পবিত্র বস্তু গ্রহণ করে। শয়তানের কৌশল হলো মানুষকে হারামের পথে প্রলুব্ধ করা, যেন সে আল্লাহর সন্তুষ্টি হারায়। যারা শয়তানের অনুসরণ করে তারা সাময়িকভাবে দুনিয়ায় সফল মনে হলেও আখিরাতে

তারা হবে পরাজিত ও ব্যর্থ। কারণ আখিরাতে সফলতা নির্ভর করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপর, আর তা সম্ভব কেবল হালাল উপায়ে জীবনযাপন করলে।

হালাল-হারামের প্রতি উদাসীনতা শুধু ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, বরং এটি সামাজিক ও জাতীয় দুর্যোগের কারণ হয়। যখন সমাজের মানুষ হারাম উপার্জন ও ভোগে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন তাদের হৃদয় কঠিন হয়ে যায়, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার শক্তি হারায়। ফলস্বরূপ সমাজে অন্যায়, জুলুম, দুর্নীতি ও অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস সাক্ষী, যেসব জাতি আল্লাহর বিধানকে অমান্য করেছে এবং হারামকে হালাল মনে করে জীবন যাপন করেছে, তারা অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই ইসলাম মানুষকে সাবধান করে দিয়েছে—হালাল-হারামের সীমা উপেক্ষা করলে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

চূড়ান্ত ব্যর্থতা কাকে বলে? ইসলামিক দৃষ্টিতে চূড়ান্ত ব্যর্থতা হলো আখিরাতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করা। যারা দুনিয়ায় হালাল-হারাম উপেক্ষা করে, তারা হয়তো সাময়িকভাবে সাফল্য অর্জন করে, কিন্তু সেই সাফল্য আখিরাতে কোনো মূল্য রাখে না। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “যে ব্যক্তি দুনিয়ায় অন্যায়ের মাধ্যমে সম্পদ অর্জন করে, সে যেন মনে রাখে, কিয়ামতের দিনে সে শূন্য হাতে ফিরে যাবে।” হারাম উপার্জন, প্রতারণা, ঘুষ, সুদ, মিথ্যা, অন্যায় ব্যবসা ইত্যাদি মানুষের কর্মফলকে নষ্ট করে দেয়।

অন্যদিকে, যারা হালালের প্রতি যত্নবান, তারা যদিও দুনিয়ায় কষ্টভোগ করে, তবুও তাদের অন্তর শান্ত থাকে। তারা জানে, আল্লাহ তাদের রিজিকের গ্যারান্টি দিয়েছেন। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে উপার্জন করে এবং তা থেকে নিজের প্রয়োজন মেটায়, সে আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয়।” তাই একজন মুমিনের উচিত—যেকোনো প্রলোভন বা লাভের আশায় হারামের পথে না যাওয়া।

আজকের সমাজে যদি আমরা হালাল-হারামের সীমা পুনরায় গুরুত্ব দিই, তবে নৈতিকতা, শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু যদি আমরা এই সীমা লঙ্ঘন করি এবং আল্লাহর বিধানকে তুচ্ছ করি, তবে আমাদের পরিণতি হবে চূড়ান্ত ব্যর্থতা—যেখানে থাকবে না কোনো সাহায্যকারী, থাকবে না মুক্তির পথ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿١﴾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

“সেদিন সম্পদ বা সন্তান কোনো কাজে আসবে না, শুধু সেই ব্যক্তি ছাড়া, যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর কাছে এসেছে।” (সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮-৮৯)

এটাই প্রকৃত সফলতা ও ব্যর্থতার মানদণ্ড। অতএব, হালাল-হারামের প্রতি উদাসীনতা কেবল ধর্মীয় অবহেলা নয়, এটি আত্মিক ধ্বংসের সূচনা। যারা আল্লাহর বিধান মেনে চলে এবং হালাল জীবনযাপন করে, তারা দুনিয়াতেও সম্মানিত এবং আখিরাতেও মুক্তি লাভ করবে।

কিন্তু যারা হারামকে তুচ্ছ মনে করে, তারা দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখের বিনিময়ে আখিরাতের অনন্ত শান্তি ক্রয় করেছে। এই কারণেই ইসলাম মানুষকে সর্বদা হালালের পথে চলার নির্দেশ দিয়েছে এবং হারামের প্রতি উদাসীনতাকে চূড়ান্ত ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আখিরাতকে ভুলে যাওয়া চূড়ান্ত ব্যর্থতার ফলাফল

মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তায়ালায় সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করা। পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী। তবুও মানুষ অনেক সময় এই সাময়িক জীবনের মোহে পড়ে যায় এবং আখিরাতের বাস্তবতা ভুলে যায়। যখন মানুষ আখিরাতকে ভুলে যায়, তখন তার জীবন থেকে নৈতিকতা, ন্যায়বোধ ও দায়িত্ববোধ মুছে যেতে থাকে। সে শুধু দুনিয়ার আনন্দ, সম্পদ, ক্ষমতা ও খ্যাতির পেছনে ছুটে চলে। আখিরাতের চিন্তা না থাকলে মানুষ আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে না; সে অন্যায়, জুলুম ও পাপাচারে লিপ্ত হয়। ফলে তার হৃদয় কঠিন হয়ে পড়ে, বিবেক মরে যায় এবং সে ধীরে ধীরে চূড়ান্ত ব্যর্থতার দিকে ধাবিত হয়।

আখিরাতকে ভুলে যাওয়া মানে হলো নিজের সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাওয়া, নিজের লক্ষ্যকে হারিয়ে ফেলা। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বহু স্থানে মানুষকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কারণ এটি ভুলে গেলে মানুষ দুনিয়ার ফাঁদে আটকা পড়ে যায়। যে ব্যক্তি আখিরাতের হিসাব-নিকাশ, জান্নাত-জাহান্নাম ও পুনরুত্থানের দিনকে অস্বীকার করে, সে নিজের আত্মাকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়। আখিরাতের প্রতি অবিশ্বাস বা উদাসীনতা মানুষের অন্তরে একধরনের অন্ধকার সৃষ্টি করে, যা তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এই অন্ধকারই হলো আত্মিক মৃত্যু — যার ফলাফল কিয়ামতের দিন হবে চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও অনন্ত শাস্তি।

আল্লাহ তায়ালা বলেন —

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّتْهَا نُوفٍ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿١﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“যারা দুনিয়ার জীবন ও তার সাজসজ্জা চায়, আমি তাদের কর্মফল দুনিয়াতেই পূর্ণমাত্রায় দিই, তাতে কোনো কমতি হয় না। কিন্তু পরকালে তাদের জন্য থাকবে আগুন ছাড়া কিছুই নয়; তারা সেখানে ব্যর্থ হবে, কারণ তারা দুনিয়াতে যা করেছে তা সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে, এবং তারা যা করত তা সবই ব্যর্থ।” (সূরা হূদ, ১১:১৫-১৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, যারা শুধু দুনিয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং আখিরাতকে উপেক্ষা করে, তাদের সমস্ত অর্জন একদিন অর্থহীন হয়ে যাবে। তারা হয়তো দুনিয়াতে সম্পদ, সম্মান ও সাফল্য পেয়েছে, কিন্তু আখিরাতে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে। কারণ তারা কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেনি, বরং নিজের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির পেছনে ছুটেছে।

আখিরাতকে ভুলে যাওয়া মানে মানুষ নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যেন সে এই পৃথিবীতে পরীক্ষার জীবন অতিবাহিত করে এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু যখন সে পরীক্ষার কথা ভুলে যায়, তখন সে পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়। একজন শিক্ষার্থী যেমন পরীক্ষার প্রস্তুতি না নিয়ে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকে, সে পরীক্ষার হলে গিয়ে কিছুই লিখতে পারে না, তেমনি যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আখিরাতের চিন্তা না করে জীবনের সময় নষ্ট করে, সে মৃত্যুর পর কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। কিয়ামতের দিন সে চিৎকার করে বলবে — “হায়, যদি আমি আমার জীবনের জন্য কিছু প্রস্তুত করতাম!” কিন্তু তখন অনুশোচনা কোনো উপকারে আসবে না।

আখিরাতের চিন্তা মানুষকে দায়িত্বশীল ও ন্যায়পরায়ণ করে তোলে। কিন্তু যখন এই চিন্তা হারিয়ে যায়, তখন সমাজে নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়। মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে বরং তাতে অংশ নেয়। লোভ, হিংসা, প্রতারণা, মিথ্যাচার ও অন্যায় চর্চা সমাজে বেড়ে যায়। কারণ মানুষ জানে না বা ভাবতে চায় না যে, একদিন তাকে এইসব কাজের জন্য আল্লাহর সামনে জবাব দিতে হবে। এভাবেই আখিরাতের বিস্মৃতি সমাজে অরাজকতা, অনাচার ও অশান্তির জন্ম দেয়।

আখিরাতকে ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হলো—এটি মানুষের অন্তরকে কঠিন করে দেয়। যখন অন্তর থেকে ঈমান ও ভয় উঠে যায়, তখন পাপ তাকে ভয় দেখায় না, হারাম জিনিস তার কাছে হালকা মনে হয়, নামাজ ও ইবাদত তার কাছে বিরজিকর লাগে। সে মনে করে দুনিয়াই সবকিছু। অথচ মৃত্যু যখন আসবে, তখন সে বুঝতে পারবে যে, সে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। কিন্তু তখন তার ফিরে আসার কোনো সুযোগ থাকবে না। যেমন আল্লাহ বলেন—

عَنْدَ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۚ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ

“যখন তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন সে বলে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একবার ফিরে যেতে দাও, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি।’ কখনোই নয়, এটি কেবল একটি কথা সে বলে; আর তাদের পেছনে আছে এক অন্তরায়, পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত।”

(সূরা আল-মুমিনুন, ২৩:৯৯-১০০)

এই আয়াত স্পষ্ট করে দেয় যে, মৃত্যুর পর আর সুযোগ নেই। তাই আখিরাতকে ভুলে থাকা মানে নিজের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা। চূড়ান্ত ব্যর্থতা হলো সেই অবস্থা, যখন মানুষ মৃত্যুর পর জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়, আর তখন সে চিরকাল আফসোস করতে থাকে।

আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে সঠিক পথে রাখে। এই বিশ্বাস মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে, ধৈর্য শেখায়, অন্যায়ের প্রতিরোধে দৃঢ় করে তোলে। কিন্তু যখন এই বিশ্বাস হারিয়ে যায়, তখন মানুষ বেপরোয়া হয়ে পড়ে। তাই আখিরাতের প্রতি উদাসীনতা শুধু ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, এটি একটি সমাজব্যাপী বিপর্যয়। সমাজ তখন ন্যায়বিচার হারায়, শান্তি হারায়, মানবতা হারায়।

সুতরাং যে ব্যক্তি আখিরাতকে ভুলে যায়, সে আসলে নিজের সবচেয়ে বড় ক্ষতির দিকে এগিয়ে যায়। তার জীবনের প্রতিটি আনন্দ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু তার আখিরাতের শাস্তি অনন্ত। তাই আমাদের উচিত সবসময় মনে রাখা — দুনিয়া ক্ষণিকের, কিন্তু আখিরাত চিরস্থায়ী। যারা আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি নেয়, তারাই প্রকৃত সফল; আর যারা তা ভুলে যায়, তারাই চূড়ান্ত ব্যর্থ।